



Vol. 26 | No. 1 | 1982



সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রমেশ শীল : অগ্রথিত গীতিগুচ্ছ

Volume	26
Issue	1
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	December 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v26i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i1.4
Pages	44-85
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রমেশ শীল : অগ্নিখিত গীতিগুচ্ছ

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

এক ॥ কবিগানের ভূমিকা

বাংলাদেশের মানুষের বোধনে কবিগান, কবিরায় ও রমেশ শীল —এই অস্তিত্বের প্রায় সমার্থক। ফলতঃ রমেশ শীল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ততম উচ্চারণের পূর্বেও কবিগান ও কবিরায় সংক্রান্ত গৌরচন্দ্রিক। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও পূর্বসূত্রের ন্যায় অপরিহার্য।

কবিগান সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর বর্ণনা নিম্নরূপ :

Kavi song is an open air performance. It is a highly exciting dialogue in verse. In fact it is a poetic battle between two contesting poets. Kavi songs were originally based mainly on religious traditions, but in later years their scope was extended to include almost all subjects. Sometimes kavi leads to violent personal attacks on the opponent producing all the thrills of the moment, thus transgressing at times the limits of decorum and decency. Occasionally the poetical conversation becomes highly witty while thousands of people listen with rapt attention.

বঙ্গে কবিগানের সূচনা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। স্বকুমার সেনের মতে,

“অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব হইতেই ছড়া কাটিয়া ঢোল কাঁসির সঙ্গতে গান করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পরে এইরূপ বাধা ছড়ার সাহায্যে আসরে উত্তর-প্রত্যুত্তর বা বাকোবাক্য পদ্ধতি চলিত হয়। ইহাই দাঁড়া কবি।”

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে অশিক্ষিত তরজাওয়ালাদের হাত হইতে দাঁড়া কবি শিক্ষিত গীত রচয়িতাদের হাতে পড়িয়া কতকটা ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হইল। আসরে বসিয়া সজে সজে প্রশ্নোত্তর গান রচনার ধারাও প্রবর্তিত হইল। ইহাই ‘কবিগান’। এইরূপ গীত যাঁহারা করিতেন তাঁহারা কবিওয়াল। নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন।”

দুই ॥ কবি-জীবন ও মানস-সূত্র

চট্টগ্রাম শহর হতে কক্সবাজার যাবার পথে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে গোমদণ্ডী গ্রাম। বাংলা ১২৮৪ (১৮৭৭ খৃ.) সনের ২৬ শে বৈশাখ (শুক্লাব) এই গ্রামে শ্রীমতী রাজ-কুমারীর গর্ভে চণ্ডীচরণ শীলের একমাত্র পুত্র রমেশচন্দ্র শীলের জন্ম।

গোমদণ্ডী রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী শীল পরিবারটির আর্থিক অবস্থা তখন ভাল নয়। রমেশ শীলের ভাষায়,

“মাতামহ কৃষক ও ক্ষোরকর্ম করতেন। পিতা পিতামহ ক্ষত চিকিৎসা ঘায়ের লতা-পাতা দিয়া আর বাত ফোরা ওপারেসান। উভয় কুল আর্থিক কষ্ট ছিল। কোনরকমে খাওয়া পড়া চলত।” ৪

সাত বছর বয়সে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করা হল রমেশ শীলকে। কিন্তু তার ঝাঁক গানের দিকে। “ছোটবেলা হতে গান-বাজনা ও ধর্মীয় ভাবধারায় পাগল ছিলাম। ... বাবা গান বাজনা আমার ঝোক দেখে প্রাইমেরি ইন্সকুলে পড়াকালীন বৃহৎ তরজার লড়াই নামক বই কিনে দেন। পাড়ায় রমেশ শীল ও শ্যামাচরণ নামক আরও দুইজন আশার সমবয়স্ক ছেলে ছিল। সন্ধ্যা পর পাড়ার লোকেরা আমাদের দুইজনকে দিয়ে তরজা মুখস্ত করা গান শুনত। সাক্র (শাস্ত্র) ভক্ত নারী পুরুষ রাধাকৃষ্ণ গানের বিষয়বস্তু ছিল।” ৫

কিন্তু, ... ‘একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইতে
বাবা গেল স্বর্গপুরে।
আমিই বালক, চালক, পালক,
আমার আর কেহ নাই।
মায়ের অলংকার সম্বল আমার
বিক্রী করিয়ে ধাই।
তিন সহোদরা, মাতা, মাতামহী,
ছয়জনে এক পরিবার।
এই হইল শিক্ষা আমার,
প্রাইমারী পরীক্ষা ভাগ্যে
না জুটিল আর।’ ৬

এই অর্থ সংকটের দিনে রমেশ শীলের স্কুল শিক্ষকরা তাকে বিনা বেতনে পড়ানোর প্রস্তাব দেন। কিন্তু বই এবং গায়ের জামা সংগ্রহও সম্ভব হল না বালকের পক্ষে।

সংসারের এইরকম সর্বব্যাপী অনটনের মধ্যে মায়ের উপর অভিমান করে কিশোর রমেশ শীল একদিন পাড়ি দেন বার্মার পথে। প্রসঙ্গতঃ, চট্টগ্রামের মানুষের তখন পর্যন্ত চাকুরী ও ব্যবসার প্রধান স্থল ছিল বার্মার রেঙ্গুন ও আকিয়াব শহর।^৭ রমেশ শীল একটানা সাত বছর বার্মায় কাটান, কিন্তু তাঁর সেখানকার পেশা সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। ফিরে আসেন ১৮৯৫-এ, চট্টগ্রামে এক প্রলয়ঙ্করী বাড়ের সংবাদ পেয়ে।

দেশে ফিরে গানের নেশা পেয়ে বসল আবার তাঁকে। এবং সেই সূত্রেই এল তাঁর প্রথম কবিগানে অংশগ্রহণ। রমেশ শীল নিজে স্ত্রীভাষ মুখোপাধ্যায়কে তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

“তখন বয়েস হবে বছর বাইশ।...”

সেবার জগদ্বাত্রী পূজো। সদরঘাটে কবিগানের আসর হবে খবর পেলাম। গাইবেন চিত্তাহরণ আর মোহনবাঁশী। দুজনই সেকালের নামকরা কবি।

... সেই রাত্তিরে গান শুনে কবি হবার শখ আমার পেয়ে বসল। তারপর দিন নেই, রাত নেই, শুয়ে বসে আমার কেবল এক চিন্তা—কেমন করে ছন্দ আর মিল দিয়ে মনের কথা হাজার হাজার মানুষের কাছে বলা যায়। রাত্তা দিয়ে হাঁটি আর মনে মনে কথার সঙ্গে কথা মেলাই।...

পরের বছর পূজোর সময় আবার সেই কবিরাজদের জলসা বসেছে। গান গাইতে গাইতে গোড়াতেই চিন্তাহরণের গলা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। মহা মুশকিল। চিন্তাহরণ না গাইলে আসর মাটি হয়ে যায়।’’

এমন সময় আসরের একপাশ থেকে কয়েকজন মুসলমান এসে জোর করে আমাকে টেনে তুলল।’’উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখি পা ঠক ঠক করে কাঁপছে।’’ মোহনবাঁশী এসে পিঠি চাপড়ে বললেন, মেরে-কেটে দাদা রাত দশটা বাজিয়ে দাও, নইলে বায়নার টাকাটা মাঠে মারা যায়। কী আর করব। যা থাকে বরাতে বলে কপাল ঠুকে উঠে দাঁড়লাম। গানের গোড়াতেই মোহনবাঁশী এমন যা তা বলে গালাগালি দিতে লাগলেন যে, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কথার তীর দিয়ে শোফম করে বিঁধলাম মোহন-বাঁশীকে। গায়ের জ্বালায় মুখে যেন আপনা আপনি কথা ছুটে যেতে লাগল। জমে উঠল আসর। আমারও গাছ বেড়ে গেল। এদিকে রাত দশটা কাবার হয়ে পরদিন সকাল দশটা বেজে গেল। আসর আর ভাঙতে চায় না।’’

সেই থেকে আমার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে বায়না পেতে লাগলাম। শুরু করে দিলাম গানের ব্যবসা।’’

সেদিনের গানের বিষয় ছিল ‘শূরপাখা ও মধু দৈত্য’। আর কবিরাজ রমেশ শীলের প্রথম পদ ছিল,

‘উৎসাহ আর ভয়
লজ্জাও কম নয়
কেবা খামাইবে কারে?’

কবিগানের প্রয়োজনেই রমেশ শীল শুরু করলেন নতুন করে অধ্যয়ন। মহাভারত, রামায়ণ, গীতা, কোরানের বাংলা অনুবাদ, কাসাসুল আফিয়া, মহানবীর জীবনী প্রভৃতি স্থান পেল তার পাঠ্য বিষয়ে।

তেইশ বছর বয়সে (১৯০০ খ্রী.) শ্রীমতী অপূর্ব বালার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন রমেশ শীল। দাম্পত্য জীবনের রোমাঞ্চ তার মনেও গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ‘‘আমার বিবাহিত জীবনে কবিগানের প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রেমের গান ও বিরহ গান সে হতে আরম্ভ।’’

রমেশ শীলের সমাজ-সচেতন কাব্য সৃষ্টির সূচনা প্রথম মহাযুদ্ধকালে (১৯১৪-১৯১৯ খ্রী.)। যুদ্ধকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের তীব্র সংকট কবিরাজের মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। তিনি রচনা করেন,

‘‘পাঁচ গজ ধুতি সাত টাকা
দেহ টেকা হয়েছে কঠিন
রমেশ কয় আঁধারে মরি
পাইনা কেরোগিন।’’

রমেশ শীলের এই সমাজ-সচেতনতাই অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন (১৯২১), আগাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘট (১৯২২), চটগ্রাম যুব বিদ্রোহ (১৯৩০) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে বিপ্লবী গণচেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

তেতাল্লিশ বছর বয়সে (১৯২০) রমেশ শীলের দ্বিতীয় বিয়ে; কন্যা শ্রীমতী অবলা বাল্য। বর্তমানে অশ্রুতিপূর্ণ এই বৃদ্ধা সারাজীবন রমেশ শীলের সাধনসঙ্গী ছিলেন।

১৯২৩-এ কবিরাজের জীবনে ঘটে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত রমেশ শীল চটগ্রাম শহরস্থ মাদারবাড়ী অঞ্চলের নহু মানুয়ের ভক্ত ছিলেন।^{১২} ছেতাল্লিশ বছর বয়সে রমেশ শীল প্রথম চটগ্রামের নাজিরহাটের নিকটবর্তী জনপ্রিয় পীরের দরবার মাইজভাণ্ডারে যান।^{১৩} তাঁর নিজের ভাষায়,

“হয়রত গাউচুল আজম কেন যে আসার মতন গিরফর লোকের উপর এমন মহান কাজের তার দিলেন তাহা তিনিই জানেন। আমি এক শুভ মুহূর্তে শ্রীযুক্ত গারদা বাবুর গঙ্গা নিয়াছিলাম তাহা বাবাজান ভিন্দা অন্য কেহ জানিবার কারণ নাই। গত ১৩৩০ সালের ৯ই মাঘ শ্রীযুক্ত গারদা বাবু আমাকে মাইজভাণ্ডার ওরশে লইয়া যান। তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রাণ যেন কি একটা অনির্বচনীয় আনন্দ হিল্লোলে খোলতে লাগিল এবং কে যেন কানে কানে বলিল, রমেশ এই মাইজভাণ্ডারের ভক্তগণকে তোর গান শুনাইতে হইবে। প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, শরীর আড়ষ্ট হইল।”^{১৪}

তরপর হতে প্রতি বছর রমেশ শীলের গান মাইজভাণ্ডারের ওরশের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। অন্যদিকে রমেশ শীলের চেতনার মাইজভাণ্ডারের ধর্মীয় তাবধারা^{১৫} ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ফলতঃ তিনি হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় কলহের ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার উর্ধ্বে নিজেস্ব স্বাপন করতে সক্ষম হন এবং বাউল সভাবাদের সমর্থনী এক ধরনের স্বষ্টিকর্তা বিশ্বাসে উপনীত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটাির মধ্যে রমেশ শীল কবিগানকে প্রচলিত অশ্লীলতা ও সামন্ত-প্রভুদের বিলাসের উপকরণ হতে মুক্ত করার সাংগঠনিক উদ্যোগ নেন। তার মনে বেদনা ছিল,

“...গ্রাম্য কবিগণ পেটের দায়ে এবং মোটা অর্থের প্রলোভনে জমিদার মহাজনদের উৎসব মণ্ডপে আসিয়া ভিড় জমাইল। বাউণ্ডলে ইয়ার-দোস্ত পরিবৃত্ত ধনী জমিদার বাবুদের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া গ্রাম্য কবিগণ অশ্লীল ভঙ্গীতে নাচিল, গান গাহিল।”^{১৬}

‘কুরুচিপূর্ণ গান ছেড়ে দাও’-এই শ্লোগান নিয়ে রমেশ শীলের নেতৃত্বে ১৯৩৮-এ গঠিত হয় “রমেশ উদ্বোধন-কবি-সংঘ”।^{১৭} কবিগানের রূপান্তরের ইতিহাসে এই সমিতি গঠনের কাজটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৪২-এ এসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী বামপন্থীদের দৃষ্টিতে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমে জনতার সামনে রাজনীতিকে উপস্থিত করার উপর অত্যন্ত জোর দেয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।^{১৮} রমেশ শীল তাঁর গানে একদিকে তুলে ধরেন মনুষ্যত্বের চিত্র, অন্যদিকে জনতাকে আহ্বান জানান ফ্যাসিবাদকে রুখে দাঁড়াতে। কবিগানকে নতুন করে জনতার সঙ্গে একাত্ম করার অঙ্গীকার নিয়ে “রমেশ উদ্বোধন-কবি-সংঘ”কে পুনর্গঠিত করে জন্ম নেয় “জেলা কবি সমিতি”। ঘটনাটি ঘটে চটগ্রামের রাউজান থানার বাগোয়ানে জেলা কৃষক সম্মেলনে কবিগানের পর (১৯৪৩)।

সম্ভবত এই বছরেই তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভাপদ লাভ করেন। পর-বর্তী সময়ে রমেশ শীলের চিন্তা ও চেতনায় কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রকাশ ঘটে অত্যন্ত প্রকটভাবে। ফলতঃ জনগণকে ভালোবাসার ও সেহনতী মানুষের মুক্তির স্বচ্ছ বিপ্লবী দৃষ্টি অর্জন করেন তিনি। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির কতিপয় রাজনৈতিক ভ্রান্তিও সময় সময় তার রচনায় প্রকাশ পায়।

১৯৪৫-এ কবিগান নিয়ে চট্টগ্রামের বাইরে এলেন রমেশ শীল। তাঁর এ পর্যায়ের প্রথম কবিগান বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুরে কৃষক সভার অষ্টম প্রাদেশিক সম্মেলনে (মার্চ, ১৯৪৫)।^{১৯} এরপর তিনি অংশ গ্রহণ করেন কলকাতায় (মোহাম্মদ আলী পার্কে) অনুষ্ঠিত ‘নিখিল বঙ্গ প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে’।^{২০} সেদিনের কবিগানের বর্ণনা পাওয়া যায় কলকাতার একটি সংবাদপত্রে এভাবে,

“All awaited the appearance of the famous bards billed for the evening—Ramesh Seal, nature’s own patriotic poet from Chittagong with an able lieutenant in Phani Barooa on the one side, and Sheikh Gomhani, champion bard of west Bengal with his lieutenant the voluble Lambodar on the other...When Ramesh Seal portrayed the devastation that imperialist exploitation has brought upon our land and sang of national unity, it was obvious that any day Ramesh could beat most speakers hollow.”^{২১}

কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে একই বছর রমেশ শীল ‘নিখিল বঙ্গ বন্দীমুক্তি কমিটি’ আয়োজিত দর্শনীর বিনিময়ে কবিগানে অংশগ্রহণ করেন। “টিকিট করেও সেদিন প্রায় বিশ হাজারের মত লোক রমেশ শীল ও ফণী বড়ুয়ার কবিগান শুনতে সমবেত হয়েছিল।”^{২২}

একই বছর রমেশ শীল নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত ‘নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনে’ কবিগানে অংশ নেন।

১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় “নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন” (AISF)-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। রমেশ শীলের উদ্বোধনী গান দিয়ে ঐ সম্মেলনের সূচনা হয়েছিল।^{২৩}

চল্লিশের দশকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের তুচ্ছাবস্থায় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ভারতের হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদীর চাইতেও বেশী হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পরস্পরের উপর। ফলে বঙ্গভূমিও রক্তাপ্লুত হল দাঙ্গা-বিত্ত্বস্ত মানুষের রক্তে। চল্লিশের মাঝামাঝি পৌঁছে স্থির হয়ে গেল বঙ্গের পুরাকল হবে মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তান। পরিণামে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা (এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা) পতিত হল এক মহাসংকটে। গুরু হল শত শত বছরের পিতৃপুরুষের বসতি-ভিটে ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেও দেশত্যাগ। বামপন্থীরা এ সংকটে কোন আশার বাণী শোনাতে পারলেন না। রমেশ শীলও এ সংকটের হালু বহন করলেন আপন চেতনায়। একদিকে কলকাতার পথে পথে (১৯৪৬) গাইলেন,^{২৪}

‘হিন্দু-মুসলিম মারামারি
দেশে এল কি ঘটনা
যত কুলী মজুর গরীব মরে,
নেতারা তাকেই মরে না।’

অন্যদিকে পাকিস্তানকে বরণ করে বললেন,

‘উড়াও লীগের পতাকা যত মুসলমান
আল্লাহ আকবর আসবে স্বাধীন পাকিস্তান ॥’

আবার আন্তর্জাতিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ তিনি উচ্চারণ করলেন,

...‘হবে শান্তি স্থাপন করেছে পণ
সগর্বে জোলিও কুরী।
শান্তির তুর্ঘনাদ শুনি,
মনেতে আতংক গণি
সাম্রাজ্যবাদী উঠেছে শিহরি।’

এবং স্থির করেন পাকিস্তানই হবে রমেশ শীলের আবাসভূমি,

‘আঁয়ার এই ঘরবাড়ি করে দিতাম।
আঁয়ারে কন ভূতে পাইয়ে হিন্দুস্তান যাইতাম।’...

[আমার এই ঘরবাড়ী কাকে দিব? আমাকে কি ভূতে পেয়েছে যে হিন্দুস্তান যাব।]

কিন্তু সাতচল্লিশ পার না হতেই বামপন্থীদের চোখে পাকিস্তানের স্বপ্ন ফ্যাকাসে হতে শুরু করল। রমেশ শীল তুলে ধরলেন স্বাধীনতা-উত্তর পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দৈন্যের কথা। ১৯৪৮-এ রণদীভের নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণী সংগ্রামের হঠকারী কর্মসূচী ঘোষণা করল। তাতেও উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিলেন রমেশ শীল।

এর মধ্যে (১৯৪৮) কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক কবিগানের অনুষ্ঠানে রমেশ শীলকে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিরায়ের পদক পরিণে দেওয়া হল।

বাহানুর ভাষা আন্দোলন গভীরভাবে রমেশ-চিত্তকে নাড়া দিল। নতুন উদ্দীপনা নিয়ে তিনি ভাষা আন্দোলনের উপর গান গেয়ে বেড়ালেন সমগ্র চট্টগ্রাম জেলায়। ১৯৫২-র এপ্রিলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত All India Cultural Conference & Festival for Peace-এ যোগদানের জন্য উদ্যোক্তারা আমন্ত্রণ জানান রমেশ শীলকে। ২৫

১৯৫৪-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রচারে রমেশ শীল সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। একই বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনে’ লোকসাহিত্য বিভাগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন তিনি এবং ঢাকা স্টেডিয়ামে কবিগান পরিবেশন করেন।

কিন্তু এই বছরেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারী করা হয়। অনেক দেশপ্রেমিকের মত রমেশ শীলের বাড়ীতে পুলিশ হামলা করে এবং তাঁকে নিরাপত্তা আইনে বিনা বিচারে বন্দী করা হয়। প্রথম তাঁকে চট্টগ্রাম জেলে ও পরে ঢাকা জেলে রাখা হয়। ঢাকা জেলে থাকাকালীন সহবন্দীরা তাঁর জন্মদিন (১৯৫৫) পালন করে। ২৬ পরের বছর পাকিস্তানে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা ক্ষমতা গ্রহণ করলে অন্য রাজবন্দীদের সঙ্গে রমেশ শীলও মুক্তিলাভ করেন। মুক্ত রাজবন্দী পুনর্বাসন তহবিল হতে তাঁকে এককালীন তিনশত টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। ১৯৫৭-তে মাওলানা ভাসানী আহত কাগমারী সম্মেলনে কবিগানে অংশ নেন রমেশ শীল।

১৯৬৯-এ রমেশ শীল মাসিক চল্লিশ টাকা হারে সরকারী ভাতা লাভ করেন। চিঠিতে বলা হয় :

In recognition of the meritorious literary activities...to the Bengali literature, Government are pleased to sanction a literary pension...২৭

কিন্তু স্পষ্টতই তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপে রুষ্ট হয়ে সরকার পরে (১৯৬২) এই ভাতা প্রত্যাহার করেন এবং রমেশ শীল গৃহীত শেষ তিন মাসের টাকা ফেরত দাবী করেন। ২৮

পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী (১৯৬১) উদ্‌যাপন সরকারের বাধার মুখে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের রূপ ধারণ করে। রমেশ শীলও রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ২৯ তাঁর রচনাবলীতেও দেখা যায় যে অ-চট্টগ্রামী বাঙালী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলাম তাঁর হৃদয়ে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে আসীন ছিলেন।

বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (বাফা) তাদের অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী (১ জুলাই, ১৯৬২) উপলক্ষে রমেশ শীলকে এক সম্বর্ধনা প্রদান করে। ৩০ মানপত্রে বলা হয় :

“... মহান লোক-সংস্কৃতির যোগ্য উত্তরাধিকার বহন করছেন আপনি। আপনার গানে এই দেশের লোকসাধারণের সর্ববাণী রূপ পেয়েছে। আপনি আমাদের গৌবরহাল।

...সার্থক শিল্পীর ও সচেতন নাগরিকের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে আপনার মধ্যে। অসাধারণ শিল্প-সাফল্য জনসাধারণের সঙ্গে আপনার দূরত্ব রচনা করেনি, বরঞ্চ নৈকট্য সৃষ্টি করেছে। ... আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আপনার নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।” ৩১

একই বছরে বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী তাঁকে সম্মানসূচক এককালীন দুইশত পঞ্চাশ টাকা ভাতা প্রদান করে। ৩২ অন্যদিকে পাকিস্তান গ্রানামোফোন কোম্পানী রমেশ শীলের গানের রেকর্ড প্রকাশ করে এই বছর।

চট্টগ্রামে (মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে) কবিরাজ রমেশ শীলকে নাগরিক সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় এর দু'বছর পর (১০ এপ্রিল, ১৯৬৪)। ৩৩ মানপত্রে বলা হয় :

“... শান্তির সপক্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার সংগ্রাম আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অক্ষয় স্বাক্ষর রচনা করিয়াছে। ...”

বিকৃতি ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আপনার অকুতোভয় অভিযান আমাদের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। ... ৩৪

কবিরাজের শেষ জীবন কেটেছে অত্যন্ত অনটনের মধ্যে। তাঁর নিজের ভাষায় :

“... হঠাৎ রোগে আক্রমণ, তদুপরি বার্ষিক্যের জরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ—যুগিবাড়া বন্যা ইত্যাদির কবলে পরে আর বাঁচবার আশা করতে পারতেছি না। অভাব অনটনে পরে রীতিমত রোগের চিকিৎসাও চলতেছে না।” ... ৩৫

১৯৬৭ সালের ৬ই এপ্রিল নিজগ্রামে রমেশ শীল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিবার ও শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। ৩৬ বর্তমানে গোমদণ্ডীতে একটি পুকুরধারে বৃক্ষছায়ায় মাটির দেয়াল ও খড়ের ছাউনি পরিবৃত্ত কবির সমাধি তাঁর আজীবন লোকবাদিতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তিন ॥ সৃষ্টির পটভূমি

রমেশ শীল নামটির সঙ্গে কবিরাল উপাধির দীর্ঘসময়ের অচ্ছেদ্য বন্ধন হতেই স্পষ্ট যে কবিগানই তার মূল স্রষ্টি। কবিগান মৌখিক ও তাৎক্ষণিক রচনা এবং দুই মূল কবি ও সহযোগীদের যৌথ অবদানে সম্পূর্ণ। ফলতঃ একে লিপিবদ্ধ করা কিংবা পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কোন প্রচলিত রীতি নেই। বলা বাহুল্য, রমেশ শীলের কোন কবিগানও পুস্তক কিংবা পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত হয় নি।

তবে কবিগানের কাঠামোর মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে খণ্ড কবিতার সম্ভাবনা ও বীজ। কবিগানের কাঠামো নিম্নরূপ : ৩৭

১. আসর-বাজা [দুই পক্ষের বাজন্দারদের পর পর দীর্ঘসময় বাজনা বাজানো।]
২. ডাক গান [দোহার কর্তৃক]
৩. সদর মালসী [দোহার কর্তৃক]
৪. রং ধুয়া [দোহার কর্তৃক]
৫. বন্দনা [মূল কবি কর্তৃক পীর, আউলিয়া, দেবতা, নবী ও স্রষ্টিকর্তার বন্দনা]
৬. টপ্পা [কবির আশ্র-পরিচয় দান]
৭. সভা-বন্দনা
৮. জেরা [কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে দুই পক্ষের প্রশ্নোত্তর। এটিই কবিগানের মূল অংশ।]
৯. রং ও বোল পাঁচালি [জেরার পরবর্তী সময়ে দেহতত্ত্ব, শাস্ত্র, ধর্ম, দেশীয় সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ক গান]
১০. যোটক [গানে জয়-পরাজয় নির্ধারিত না হলে আপোষমূলক মিলন সঙ্গীত।]

স্পষ্টতঃই এই কাঠামোর তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও নবম অংশ পৃথক কবিতা হিসেবেও স্রষ্টি এবং সমাদৃত হতে পারে। তাই বাল্য এবং কৈশোরে কিছু পদ্য রচনা করলেও রমেশ শীলের কাব্যচর্চা কবিগানের অংশ হিসেবে গুরু, এমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হবে না।

বিশেষতঃ কবিরালের রচনার মধ্যে মালসী, আত্ম-পরিচয়মূলক কবিতা এবং রং ও বোল পাঁচালির উপস্থিতি এ সিদ্ধান্তের সমর্থনবাহী।

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে রমেশ শীলের প্রেম ও বিরহের কবিতার সূচনা তাঁর প্রথম বিয়ের সমকালে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি রক্ষণশীল গ্রাম-সমাজে তেইশ বছরের তরুণ রমেশ শীলের প্রথম নারী-প্রণয় লাভে রোমাঞ্চিত ও শিহরিত না হওয়াই অস্বাভাবিক। এবং যেহেতু মূলতঃ তিনি কবি, সুতরাং রোমাঙ্কের প্রকাশ ঘটবে কাব্যে, এও নিতান্ত স্বাভাবিক। আবার বিশ বছর পর দ্বিতীয় বিয়ে অনিবার্যভাবেই ইঙ্গিত দেয় এর পূর্ববর্তী একটি বেদনা-বিধুর বিরহ পর্বের, যার ফসল রমেশ শীলের বিরহের গান।

ছেতল্লিশ বছর বয়সে রমেশ শীল প্রথম মাইজভাণ্ডার যান। মাইজভাণ্ডারের পীরের দৃষ্টি প্রথম চমকেই তাঁকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে। রমেশ শীলের অধ্যাত্ম-বিষয়ক রচনার এখানেই সূত্রপাত, যদিও কবিগানেও ছিল অধ্যাত্মচর্চার বীজ।

সাধারণ মানুষের দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে রমেশ শীলের পরিচয় ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, কষ্টকল্পিত নয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ; তাঁর সারাজীবন কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। জীবনে নিরানু কৃষক-বাস পল্লীগ্রাম ছেড়ে দ্বিতীয় কোথাও আবাস স্থাপন করেন নি। মনুষ্যের সাধারণ মৃত্যু দেখেছেন, দুর্ঘোষে নিজে গৃহহারা হয়েছেন। তাই তাঁর কবিতায় মানুষের দুঃখের বারোমাসী এসেছে অত্যন্ত সহজে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আপাদমস্তক সিক্ত করে।

তেমনি রাজনীতিও শুরুতে তাঁর জীবনে আসে নি কোন তত্ত্বের চকচকে ষোড়ক নিয়ে। সাধারণ মানুষের দৈন্যের জন্য দায়ী ব্রিটিশ সরকার—এ ছিল তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বোধ। তাঁর নিজ থানা বোয়ালখালী বিশ শতকের শুরুতে ছিল সূর্যসেন আর তাঁর সহকর্মীদের প্রশিক্ষণের এলাকা। কল্পনা দত্ত সহ অনেকে এই থানার অধিবাসী ছিলেন। আর জেলা পর্যায়ে যতীন্দ্রমোহন সেনের নেতৃত্বে চলছিল ব্রিটিশ-বিরোধী গণ-প্রতিরোধ। এই জোয়ারে রমেশ শীল আপনিই মিশে ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন সভায়, মিছিলে, কারাগারে। পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর রাজনীতিতে যুক্ত করল মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। তাই, রমেশ শীলের রাজনৈতিক সাহিত্যচর্চার উপাদান ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যেই।

আবার লোককাব্যের সুর তিনি আয়ত্ত্ব করেছিলেন শৈশবেই। কেননা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদেও সমুদ্র-মেখলা অরণ্য-কুন্তলা চটগ্রাম ছিল চারণের ছড়ায়, বাড়লের গানে, বৈষ্ণবের কৃষ্ণনামে, নারীকণ্ঠের হাঁওলায়, মহরুরমের জারীতে আর মাঝির ভাটিয়ালী সুরে উন্মনা। রমেশ শীলের ধমনীর মধ্যেই পল্লীবাংলার এই সুরের রেশ ছিল।

রমেশ শীল ছিলেন ব্যঙ্গ-রসিক মনের অধিকারী মানুষ। তাঁরই একজন সহকবির ভাষায়,

‘রমেশের রসিকতায় হাস্যের নাই অবধি।

কাইমবাজা বাজাইত হস্তে লইয়া যদি।

মধ্যে মধ্যে মান দিত কমিকের সুরে।

শ্রোতার আনন্দ বৃদ্ধি হইত যাহার জোরে ॥’ ৩৮

রমেশের বিবিধ রচনা এই ব্যঙ্গ-রসিক মনের ফসল।

চার ॥ রচনা-পরিচয়

কবিরাম রমেশ শীলের মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা বাইশ।

মুদ্রিত রচনায় অধ্যাত্ম বিষয়ই প্রধান। মাইজভাণ্ডারের উপর রচিত হয়েছে “ভাণ্ডারে মাওলা” (৪৩ টি গান), “আশেক মালা” (৪২ টি গান), “শান্তি ভাণ্ডার” (৪১ টি গান), “নুরে দুনিয়া” (৪০ টি গান), “সত্য দর্শন” (৪২ টি গান), “জীবন সাথী” (৩৭ টি গান), “মুক্তির দরবার” (৩৮ টি গান) ও “মানববন্ধু” (৪০ টি গান)। কাউখালীর পীরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত রমেশ শীলের পুস্তকের নাম “এক্সে সিরাজিয়া” (২৪ টি গান)। তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানের সংকলন হল “বিচ্ছেদ তরঙ্গ বা হরি সংকীর্তন” (৪৫ টি গান)।

রমেশ শীলের দেশাত্মবোধক রচনা সংকলনের সংখ্যা আট। এগুলো হল “দেশের গান” (৩২ টি গান), “ভোট রহস্য” (পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত); “পাকিস্তান সঙ্গীত” (১২ টি গান), “দেশ দরদী গানের বহি” (১০ টি গান), “শীল সমিতির কবিতা” (৭ টি গান), “লোককল্যাণ” (১৪ টি গান), “তুফানের কবিতা” (৩ টি গান) ও “বদলতি জমানা” (৯ টি গান; বেদুঈন ছদ্মনামে লিখিত)।

রমেশ শীলের রচিত লোকগীতির একমাত্র সংকলন “চাটগাঁয়ের পল্লীগীতি” (১ম ও ২য় ভাগ; মোট ৫১ টি গান)। তাঁর বিবিধ-বিষয়ক রচনার সংকলন হচ্ছে “মহাবাক্য” (৪ টি গান) ও “ভগুসাদুর কবিতা” (৩ টি গান; ঋষিভক্ত ছদ্মনামে লিখিত)। এ ছাড়া রমেশ শীলের প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে রয়েছে নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী সহযোগে রচিত “গান্ধীহত্যার কবিতা”।

এছাড়া কবির জীবিতকালে মুদ্রিত পুস্তক-তালিকায় নিম্নোক্ত পুস্তকাবলীর নাম পাওয়া যায় :

“আত্মতত্ত্ব” বা “আশেকমালা” (৩য় ভাগ); “চটল পরিচয়”; “চাষীর গান”; “বিধবা বিবাহ বা সমাজ রহস্য”; “বার আউলিয়ার কবিতা”; “দেশ পরিচয়” ও “সত্য দর্শন”। কিন্তু এগুলির কোন মুদ্রিত কপি কিংবা মুদ্রিত হয়েছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

নিজস্ব পুস্তকের বাইরে রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ গান ও ছড়ার সংকলন “লোকগীতি” (এপ্রিল, ১৯৬৪) প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম থেকে (সংকলিত গানের সংখ্যা ১১৩ টি)। ৩৯ কলকাতা হতে কিছুদিন পূর্বে (এপ্রিল, ১৯৭৮) প্রকাশিত হয়েছে “গণ কবিরাম রমেশ শীল ও তাঁর গান” (মোট ১০১ টি গান সংকলিত হয়েছে)। ৪০ সংকলনসময়ে কয়েকটি অগ্রথিত রচনা থাকলেও মূলতঃ গ্রন্থ-মুদ্রিত গানই এতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

শেষজীবনে রমেশ শীল এক পত্রে দুঃখ করে লিখেছিলেন, “...আমার অনেক ছড়া গান ছাপা হয় নাই। টাকার অভাবে ছাপান গেল না। ...কি জানি আমার জীবদ্দশায় হয়ে ওঠে কিনা।” ৪১

জীবদ্দশায় কবির সাধ পূর্ণ হয়নি, মৃত্যুর পরেও নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রমেশ শীলের গৃহ ভস্মীভূত হয়েছিল। দেবক্রমে পাণ্ডুলিপির যে কয়েকটি খাতা রক্ষা পেয়েছে, তাতে কবিরামের অগ্রথিত রচনার সংখ্যা শতেরও কম। তার একটি অংশ (৪৩ টি অপ্রকাশিত কবিতা) সম্প্রতি ‘পাণ্ডুলিপি’তে প্রকাশ করা হয়েছে। ৪২ অন্য একটি অংশ এখানে পত্রস্থ করা হল। এই অংশটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত, কিন্তু কবি প্রদত্ত চিহ্ন অনুযায়ী অনুমিত হয় যে এগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পাঁচ ॥ অপ্রথিত-রচনাপ্রদর্শনী

[সংকলক সংগৃহীত কবিরায়ের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত পুস্তকের ভিত্তিতে পুস্তকাকারে অপ্রথিত রচনার এই গুচ্ছ প্রস্তুত করা হয়েছে। সম্ভাব্য সতর্কতার পরও পুস্তকাকারে প্রকাশিত কোন রচনা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে সে-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুধীজনকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বলা বাঞ্ছনীয় রচনামুদ্রণে আধুনিক বানান ব্যবহার করা হয়েছে।]

বিষয়-অনুসারে রমেশ-রচনাবলীকে চারটি অংশে বিভক্ত করা যায়,

- (ক) আধ্যাত্মিক,
- (খ) দেশাত্মবোধক,
- (গ) লোককাব্য,
- (ঘ) বিবিধ।

এখানে প্রকাশিত গীতিগুচ্ছে লোককাব্য ছাড়া অবশিষ্ট তিন রকমের রচনাই বর্তমান।

ক ॥ আধ্যাত্মিক :

এখানে পত্রস্থ ১-৩ সংখ্যক রচনা মাইজভাণ্ডারের পীরের উদ্দেশ্যে এবং ৪-১১ সংখ্যক রচনা চট্টগ্রামের সাতগাছিয়ার জনৈক পীর মুলতানপুরীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

[১ গান তাল দাদরা]

ওরে মানব ঠিক মানব হও, হিংসা নিন্দা ছেড়ে।
 (ওরে মানবরে) আদম হতে বিচার কর, তবে মানব হতে পার
 এই দুনিয়া কেবা সৃষ্টি করে।
 হাদিস কোরাণ সাফী, কীট পতংগ পশু পক্ষি
 নানা জাতি সৃষ্টি কর তারে ॥
 (ও মানবরে) প্রথমে এক ছিল, এক হতে দুই জন্মিল
 আদম ছিল হাওয়া হল পরে।
 বেণু বেচু পরোয়ার, শরিক ছিলনা তার
 হাবিবকে বানাইল নিজ নুরে ॥
 সেই নুরে জগত হল, হিংসা করে করি বল
 হিন্দু মুসলিম সকলি ঐ নুরে।
 মানুষ মাত্র আদমজাত, তাতে কিছু নাই তফাৎ
 হিংসা চুনায়ে ভাও বরবাদ করে ॥
 (ও মানবরে) মৌলভী মওলানায় কয়, যেই ঘরে কুকুর রয়
 ফেরেস্তু ঢুকেনা সেই ঘরে।
 মানবদেহে ফেরেস্তু, সাধ্য নাই আর চুকিবার
 হিংসা কুকুর যদি রয় শরীরে ॥
 চিস্তিয়া তরিকা মতে, হালকা জিকির তাল যশ্বতে,
 যায়েজ নয় যারা বলে জোরে।
 সুদখোর বাড়ী দাওয়াত পেলে, মাছে গোস্তে বেশী খাইলে
 এই যায়েজখান বুঝায় যারে তারে ॥

(ও মানবরে) ওয়াইজ নছিয়তে গেলে, মাইজভাণ্ডারের বদনাম তোলে
ইচ্ছাগত হিংসার ভাণ্ড ঝারে ॥

[২]

ঘরে বসে রইলি কার আশায়
ঐ যে আমার বন্ধুর বাঁশী শুনা যায়।
বাঁশীতে কি মোহন সুরে প্রাণ কেড়ে লয় কে যাবিরে আয়রে আয় ॥
মোহনীর জানে, কুলসান বিসর্জন দিয়া প্রাণ ধরে টানে,
আমার বন্ধুর বাঁশী মন উদাসি বাজে বুঝি অনিচ্ছায় ॥
থাকে বন্ধু ঢাকা শহরে, সাধ করে করেছে বাসা আদমনগরে,
ঢাকার ঢাকা উল্টে গেলে ত মন তারে দেখা যায় ॥
ঢাকা শহর অতি মনোহর চার কাহারি নয় পরগণা মধ্যে বন্ধুর ঘর,
বন্ধু মধ্যে মধ্যে উঁকি মারে মেঘেতে বিজলির প্রায়।
রমেশ বলে বিনয় বচনে, শব্দ উদ্দেশিয়া চল বন্ধুর সদনে,
শুনে বাঁশীর ধ্বনি ভাব তরণী প্রেম যমুনায় উজান যায় ॥

[৩]

চিন্তা কিরে কলির জীবের ত্রিতাপ জ্বালায় ঔষধ আছে,
মূল কবিরাজ দয়ালগুরু খোজ করে চাও গুরুর কাছে।
মহামন্ত্র বটি নিয়া, করল অণুপান দিয়া
ভক্তি মধুতে মিশাইয়া খেলে জটিল রোগী বাঁচে।
উপসর্গ দশ ইন্দ্రిয়, দুই রিপু কুপথ্য প্রিয়,
তারে অন্তরমুখী করে নিও, সব যন্ত্রণা যাবে ঘুচে।
কামে চায় কামিনী কোলে, ক্রোধে চায় কলহ তোলে,
লোভে কয় মাছ মাংস ঝোলে, খেলে তবে পরাণ বাঁচে।
মোদের হল অহংকার মূল, মোহবেটা রূপে আকুল,
মাংসবোঁড়ার ঘটে চক্ষু শূল পরশীতে বুক জ্বলতেছে।
রিপুর ফট ফটানি হতে, ইচ্ছা যদি মুক্তি পেতে,
চেতন গুরু ব্যবস্থাতে, সব যন্ত্রণা যাবে ঘুচে ॥

[৪ গান তাল কাহাঁরবা]

শুন বন্ধুগণ বড়পীরের আশনের বিবরণ।
ভক্তিভাবে হাজির হলে সর্বদুঃখ হয় মোচন।
সুলতানপুরি কাজি বংশ পীর গোর বুজগান,
পুরুষানুক্রমে আছে এই আসনে বর্তমান,
কামালিয়ত হাসেল করে করে এই আসন রক্ষণ।
জগতের হিত করিবারে মনে করে কামনা,
শতে শতে এতিম এনে খুলেছে এতিমখানা,
হাফেজ মৌলভি মাওলানা হয়ে যাচ্ছে এতিমগণ।
বড় পীরের আসনের পার্শ্বে পীর বুজগের মাঝারে রয়,
নিয়তে করিলে মানত হাতে হাতে সিদ্ধ হয়,
কত রুগী আহাল হল কে করে তাহার গণন।

কামেল বিনে সেই আসনে বসতে কারও সাধ্য নাই,
মনে প্রাণে বিশ্বাস হবে দেখনা দরগাহে যাই,
আওলাদে পাক আবুল বাবা করে ফয়েজ বিতরণ।
রমেশ বলে সেই দরবারে দিবা নিশি যেতে চাই,
ঘাটে এসেছে নৌকা ভাগ্য মন্দ বেলা নাই,
রঙ্গরঙ্গে সময় কাটাই শেষ দিনের নাই আয়োজন।

[৫ গান তাল আন্ধা]

ও দরবারী ভাই মনকেরের তাসা দেখনি,
(তারার) আসেকিরে নিন্দা বিনে পেটের ভাত হজম হয়নি।
জাহেরি এলেম হেজার হয়, এই কথাটা মিথ্যা নয়,
মসনবি কিতাবে কয়, মওলানা রুমির বাণী।
ব্রমর ফুলের মধু খায়, মাছি বিষ্টার দিকে যায়,
দুইজনকে বানাইল খোদায় দুই জিনিস তার আমদানি।
আসেকিরা হালকা করে, তাদের চোখে কুটা পরে,
হালকায় কি ফজিলিয়ত বাড়ে হিয়ান তারা জানেনি।
ছেমাতে যার মনে সন্দহ, নিশ্চয় তার ভাগ্য মন্দ,
সূর্যালোকে পেঁচা অন্ধ, আমরা তা আগে জানি।
ছেসা করি ওফাত হলে, রোয়াজা হয় দরবার মিলে,
নাখে নাখে বাড়ি জ্বলে, তারার কিছু জ্বলেনি।
কোরান হাদিছ কিতাব পড়ে, নায়েব নবি টাইটেল ধরে
হিংসা করা কোন কিতাবে পাইল তারা কি জানি।
তারা খুশি হিংসা করি, আমরা খুশি গুরু ধরি,
রমেশ বলে সুলতানপুরি বিনে কিছু না চিনি।

[৬ গান তাল দাদরা]

এক মুখে কি বলব আমি সুলতানপুরির গুণের কথা,
পবিত্র বংশ যফুর আছে যথা তথা।
বংশ পরস্পর হতে, আছে বড়পীর আসনেতে,
চার তরিকা প্রকাশিতে তিনির মত কে কৈ কোথা।
বনের পশু বাঘ ভল্লকে, তান কদমে মাথা রাখে,
জীন পরি হর সবাই ডাকে রাত্রে আসে দেব দেবতা।
নিজে ধরা দেয় না যারে, সে চিনিবে কেমন করে,
চান সুরুজ সবার উপরে আজ তান অসীম ক্ষমতা।
আবুল বাবা দিনে রাতে, ফয়েজ বিলায় রুহানিতে,
কেহ ফিরবেনা খালি হাতে বুঝিলে রমেশের কথা।

[৭ গান তাল আন্ধা]

আশেকের নয়ন মণি ওরে দয়াল সুলতানপুরি,
বাবা তোমার রহমতে, পার হয়ে যায় শত শত,
আমি এলাম শেষ বেলাতে পার করে দাও স্বরা করি।

আমার শেষে এল যারা আগে পার হ'ল তারা,
কদম নৌকায় হুকুম ছাড়া আমিত উঠতে নারি।
ছিল যার ভক্তির পূজি পার কাণ্ডারী করল রাজী,
জানি তুমি দয়াল মাঝি আমারতো নাই টাকা কড়ি।
কড়ি ছাড়া সর্বহারা, শেষ খেয়ায় পার হবে তারা,
একটু জায়গা আর ইশারা না দিলে মুই প্রাণে মরি।
সন্ধ্যা হল রয়েছে বই, আর খেওয়া নাই পার হল্যাম কই,
রমেশ আছে এক আশ নই বুঝতে মাঝির ছলচাতুরি ॥

[৮ গান তাল দাদরা]

আমায় পাগল করে কান্দাইতে এই ছিল কি তোমার মনে,
জলে পুড়ি ছাই হয়ে যায় তোমার প্রেম বিচ্ছেদ আগুনে।
একি ভালবাসার ফল, গোড়া কাটি আগাতে জল,
হল্যাম আমি পথের পাগল মোহনরূপের আকর্ষণে।
শমসের তবরেজ চামড়া দিল, দুরমদ নিজে কতল হল,
মুছা নুরি মুচ্ছা গেল, তোমার ঐ রূপ দর্শনে।
মনছুর উঠে শুলের পরে, জাকারিয়ার মাথা চিরে,
খলিল পুত্র ভবাই করে, একমাত্র তোমার কারণে।
গাউচ বাবা সুলতানপুরি, জুদাই দুঃখ সহিতে নারি,
রমেশ কয় আর কত পারি মরি তোমরা অদর্শনে ॥

[৯ গান তাল গৌর থেমটা]

চঞ্চল মন তুই পাগল হয়ে তালাস কর কার,
সেইত বসে মুচকি হাসে তোর হৃদয় মাঝার।
আঠার হাজার মকলুকাতে, সেইত আছে সব জাগাতে,
অখণ্ডকে খণ্ড করে ভগ্নামি তাহার ॥
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সবাই চালক আছে যারা,
হিন্দু মুসলিম খৃষ্টান বৌদ্ধ নাই তার ভেদ বিচার।
রিপুর ফেরে মায়ায় ঘোরে, চিনতে চেকা সেই বন্ধুরে,
হাশর ময়দান ছেরাত পারে বন্ধু নাইরে আর।
তার যাহের বাতেন, দুই মুরতি বুঝে দেখ,
মন মন্দ মতি, ছয়াল জাহের ছয়াল বাতেন শুদ্ধ কাল্যাম তার।
পীর চিনিলে তারে চিনে, বিনা মূল্যে হীরা কিনে,
রমেশ কয় সে এই ভুবনে শুদ্ধ ঈমানদার।

[১০ গান তাল গৌর থেমটা]

ভরসা নাই ভরসা নাই তুমি গুরু বিনে,
তুমি অগতির গতি, তুমি সুখদুঃখে সাথীরে ও গুরু
চরণ তলে স্থান দিও অধীনে।

মোরে দুনিয়ায় বিদায় দিলে কাঁচা মাটির পরে,
 গেলেও ও গুরু মনকির নকির পুছিবে যখনে।
 সেই ছোঁয়ালের জবাব দিতে, তুমি থাকবে আমার সাথে,রে,
 ও গুরু আজি করি রাখি সেই কারণে।
 আর এক সংকটের দিন কেহ করে দিবে না চিন্তা,
 ও গুরু পুলছেরাত পার হব সেই দিনে।
 আমি পথ হারাই বিপথে গেলে, ইশারা দিও সেই কালেরে,
 ও গুরু বান্দব নাই আর আমার দোজাহানে।
 রমেশ কয় যে যারে চিনে, পরাণ দিলেও তারে কিনে রে,
 গুরু আমার পরিচয় হলনা গুরু সনে ॥

[১১ গান তাল এক তাল]

মানবজনম গেল বিফলে,
 গুরু সাধনা হলনা মোর কপালের ফলে।
 যৌবনে ন করি সাধন কি করি বুড়া কালে।
 তরুণ বয়সে গায়ের যোশে হেড-উচল ভেদ নাই,
 যৌবনে রমণী আছিল সকল সুখের ঠাঁই,
 এখন বল বুদ্ধি সকল হারাই কি হবে মোর শেষ কালে।
 যেই বাহুর বলদর্পে লোক, ভয়ে জরসর,
 সেই বাহু মোর লাঠি ধরি কাঁপে থরথর,
 আমারে আমি দেখিনা, আয়না ধরি মুখ চাইলে।
 যৌবন কালে ছিল আমার দোস্তের হাট বাজার,
 এখন সাতবার ডাকি দেখা না পাইর কি ভাগ্য আমার,
 চলন শক্তি রহিত হল কি উপায় আজরাইল আইলে।
 রমেশ কয় ছননি তাই স্নলতানপুরির নাম,
 এক পলকে করে দিবে ষাইট বছরের কাম,
 বড়পীরের বদলা দেখবা হাতগাছিয়া দরগায় গেলে।
 চিলর ঝাপটায় মুরগীর বাচা পাখা দি ঢাকিব,
 আবুল বাবা মুরিদরে তরুণ রাখিব,
 যদি পীর মুরিদে এক হৈ যাইব আজরাইলে কাকে নিব ন পাই ॥

থ ॥ দেশাত্মবোধক :

রমেশ শীলের দেশাত্মবোধক রচনা বিষয়-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এখানে পত্রস্থ রচনাগুচ্ছের মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ-বিরোধিতা (১৪), সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ডাক (১৫, ২৭), ভাষা আন্দোলনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য (১৬), শিক্ষা সংকট (১৭, ২০, ২৬), বিধবার বেদনা ও নারীর অধিকার (১৮, ৩৪, ৩৫, ৩৬), কৃষি ও কৃষকের সংকট (২৩), অর্থনৈতিক বৈষম্য (১৯, ২১), ১৯৬৪-র নির্বাচন (২৮, ৩০), পরিবার পরিকল্পনা (২৫), চট্টগ্রামের বন্যা (২৪), ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ (৩১, ৩২), আইয়ুব খানের কুশাসনের প্রতিবাদ (৩৩), মানবতার জয়গান (২২), মওলানা ভাসানীকে অভিনন্দন (২৯) প্রভৃতি বিষয়।

এখানে তাঁর দেশাত্মবোধক রচনাগুলি কালানুসারে [৩৪-৩৬ ছাড়া] গ্রথিত করা হয়েছে।

[১২ দেশপ্রেমমূলক গান তাল কাহারবা]

উজান বেয়ে চলরে গাঝিভাই সব উজান বেয়ে চল ।
 ঐ দেখা যায় রঙ্গীন সূর্য রক্ত উজ্জ্বল ॥
 প্রথমে বাংলাদেশ আবাদ করল যারা ।
 বাড়় ঝাপটা অতিক্রম করে চলে গেছে তারা ।
 শ্বেতাংগ হাতে তারা হয়ে নির্যাতিত ।
 বাংলাদেশে বাংলার ছেলে গেল শত শত ।
 মাঝি উজান বেয়ে চল ।

এখন দু'হাতে তুলতেছি তাদের বীজ বোনা ফসল ॥
 দেশকে যারা ভালবাসল গাতৃভূমি বলে ।
 রাজদণ্ড জয়টিকা আঁকা তাদের ভালে ॥
 পাষণ্ড কারা ভাসাইল দিয়া মাথার ঘাম ।
 ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিখা আছে নাম ।
 মাঝি উজান বেয়ে চল ।

তাদের অসম্পূর্ণ কাজের জন্য ছুটে আয় সকল ॥
 সোনার বাংলায় সোনার ধান ফলিত প্রচুর ।
 পাল পার্বনে হিন্দু মুসলিম আনন্দে ভরপুর ।
 সেই জমি নষ্ট করে আবর্জনায় ঘেরি ।
 উপবাসে মরে হিন্দু মুসলিম নরনারী ।
 মাঝি উজান বেয়ে চল ।

এখন দুহাতে উপরি ফেল যত আগাছা জঙ্গল ॥
 আজ আমরা এক হয়েছি হিন্দু মুসলমান ।
 সবার সংগে মিলিয়ে গলা গাইতে হবে গান ॥
 মোদের আগে আগুন নিয়ে করায় যারা খেলা ।
 সেই আগুনে মৃত্যুদণ্ডে করব অবহেলা ।
 মাঝি উজান বেয়ে চল ।
 সেদিন হবে পল্লী কবির সাধনা সফল ॥

১৯-১১-৪০, কলিকাতা ।

[১৩ গান তাল দাদরা]

প্রাণ দিয়ে ভাই খাটতে হবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের তরে,
 আমার দেশের ভাইবোন না বাঁচিলে আমি বাঁচি কোন দরকারে ।
 খাদ্যনীতি, সমাজনীতি, ভিনু থাকুক তায় কি ক্ষতি,
 আমরা বাঙালী জাতি বিজাতি ভাবিব কারে ।
 নর ঘটে নারায়ণ, কোরাণ পুরানের বচন,
 নর সেবা করে যেইজন, এবদতি কই তাহারে ।
 রসুল আল্লাহ সহি হাদিসে, মানবের সেবা প্রকাশে,
 মানবকে যে ভালবাসে, খোদা ভালবাসে তারে ।
 একতা সহনশীলতা, এই আমাদের প্রাণের কথা,
 বাঁচাব দেশের জনতা, পরস্পর প্রচেষ্টা জোরে ।

১৮-৬-৪১, গোমদণ্ডী ।

[১৪ ছড়া বৃত্তি অত্যাচারী]

অত্যাচারী দল জুলুমবাজ সকল অচিরে হইবে নাশ,
এ দুঃখ ভাবিয়া বিপ্লবী হইয়া কত যুবকের কারাবাস।
এক মুঠ অনু তরে গিয়া তোদের ঘারে কান্দিয়া মরেছে যারা,
তোদের চক্রে পরি সেজেছে ভিখারী জাতভিখারী নয় তারা।
প্রাণের আশায় প্রাণ নাহি চায়, তোরা কি বুঝিলি তাহা,
রক্ষভাবে দুঃখ দিলি বেটা মুখ পশুতে করেনা যাহা।
ব্যবসার ছলে আসিয়া একুলে ডাকাতি ব্যবসা নিয়া,
ভৃত্য হইল রাজপথের মালিক লোকের চক্ষু ধুলা দিয়া।
পরের ধনে দেখি অল্পদিনে সাজিলি সওদাগর,
পোশন তুলিলি শোষণ করিলি বসায়ো নানা কর।
অন্ধকূপ হত্যা কলংক চাপালি, নিষ্কলংক লোক শিরে,
আসিবে একদিন বিচারের সময় স্তব্দ-আসল হিসাব করে।
রাশিয়ার জার মহা অত্যাচার কৃষকেরে করিয়াছিল,
সকল মিলিয়া বিপ্লবী হইয়া মাথা টিপিয়া দিল।
সেইরূপ ভারতে হিন্দু মুসলিমেরে যেইদিন এক হতে পারে,
সেইদিন বুঝিবি প্রতিফল পাবি শোষণ করেছিস কারে ॥

৮-৯-৪৩, চট্টগ্রাম।

[১৫]

ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করি কি স্বেচ্ছের আশায়,
হিন্দুস্থান কি পাকিস্তান বিবাদে পাওয়া যায়।
বিলাতে শ্রমিকদল যত, সকলে হয়ে মিলিত,
এসের দল পরাজিত, করে আইন সভায়।
একতা মহাগুণ, ধ্বংস করে ধনতন্ত্র, কায়েম হয় গণতন্ত্র,
কেবল একতায়।

মোদের যখন বিবাদ মুঠে, সামরাজ্যবাদ মজা লুটে,
চোখ থাকতে দেখি না মোটে, জন্ম অন্ধ প্রায়।
সারা দুনিয়ার লোকে, সকল প্রগতি মুখে,
ভারতের লোক অন্য দিকে, যাচ্ছে কোন কথায়।
এখনও মংগল চাও, ভাইয়ের পাশে ভাই দাড়াও,
একযোগে দাড়ায়ে হবে সব দাবী আদায় ॥

৮-১০-৪৪, কলিকাতা।

[১৬ ভাষার গান]

স্মরণীয় দিন বাঙালীর স্মরণীয় দিন।
রমনার মাটি ছাত্র রক্তে লাল হয়ে গেল এই দিন ॥
যত হিংস্রকের দলে, মাকে ছাড়ি বিমাতাকে মা ডাকতে বলে।
আমরা নিজের মাকে মা ডাকিলে তাঁরা করে মুখ মলিন ॥
ছাত্ররা দাবী জানাইল, কোন পরানে কচি বুকে গুলি চালাইল।
তেমনি দুয়কার্যের ফল ফলিয়া শক্তিবান হইল শক্তিবান ॥

শুন ভাই-ভগিনীগণ, বাঙালীর বাংলা ভাষা মার দুধের মতন ।
 ভাষা গেলে জাতির মরণ, জল গেলে বাঁচেনা মাছ ॥
 ভাষা জাতির মহাধন, মুখের ভাষা রাখতে যারা দিয়াছে জীবন ।
 এই শহীদ স্মৃতি রাখব স্মরণ দেহে জীবন যতদিন ॥

১০-৫-৫২, গোমদগুী ।

[১৭ ছাত্র দেশের ভরসা]

ছাত্ররা মুক্তি সেনা, অস্বীকার করা যায় না,
 ছাত্ররা দেশের হিতৈষি ।
 স্বাধীন মনোভাব নিত্য, সর্বদা নির্ভীক চিন্তা,
 ছাত্ররা দেশের শান্তির প্রত্যাশী ।
 স্বাধীনতায় ছাত্র আগে, আন্দোলনের পুরোভাগে,
 সবাইর পক্ষে ছাত্র ভবিষ্যত ।
 আন্দামানের বন্দী মুক্তি, ছাত্রদের অতুল কীর্তি,
 সর্ব কাজে উদ্দেশ্য মহত ।
 অন্ধকূপ হত্যার কথা, ছাত্র প্রাণে লাগে ব্যাথা,
 সেই কলংক ছাত্ররা ষুচায় ।
 ছাত্র দেশের প্রিয়, সকলের আদরণীয়,
 নতুন দিনের উজ্জ্বল আশায় ।
 জাতির সংকট মুহুর্তে, ছাত্র অগ্রণী তাতে,
 ভাষা আন্দোলন তার পুমাণ ।
 কেপ্টেন রসিদালি মুক্তি দিতে, দাঁড়ায়ে সদর রাস্তাতে,
 কদমরসুল রামেশ্বর দিল প্রাণ ।
 টাকা পয়সা সম্পদ নয়, মূল সম্পদ চরিত্র হয়,
 চরিত্র মানবের সঞ্চয় ।
 চরিত্রহীন ঘটে যেই, জগতে স্থানতো নেই,
 ছাত্র চরিত্র অতিশয় নির্মল ।
 গরীব ছাত্র পড়া হয় না, প্রাইভেট মাষ্টার রাখা যায় না,
 অভাবে গরীব ছাত্র বাড়ী ।
 শতকরা বিশটি ছেলে, প্রাইভেট মাষ্টার রাখে বলে,
 পরীক্ষায় যেতেছে পাশ করি ।
 এই ভাবে লিখাপড়ায়, দেশের উন্নতি কোথায়,
 দেশের লোকে কি জানি কিভাবে ।
 শিক্ষার আলো না জ্বালালে, জাগিবে লোক কি বলে,
 অশিক্ষার আন্ধারে ঘেরিবে ॥

১০-৯-৫৩, ঢাকা ।

[১৮]

অনিচ্ছায় চক্ষু বুজি, হয়েছে উচ্ছিষ্ট ভোজি, সমাজতার বিচার করেনা ।
 অর্ধেক অঙ্গ স্বাধীন হল, অর্ধেক পরাধীন রইল
 এই নাকি স্বাধীনতার নমুনা ।

স্ত্রী বন্ধু দাসি প্রভু, এমন কি মিলে কভু,
 একমাত্র নারীতে সম্ভব ।
 নারী পুরুষ স্তমিলনে স্বর্গ সুখ তুচ্ছ মানে,
 সেই ঘরে নিত্য মহোৎসব ।
 কল্পনা আর প্রীতিলতা, এই দুই মেয়ের কথা,
 লোকে কি যাইবে কভু ভুলি ।
 ঠেলিয়ে সমাজের মাথা, এই দুই বীর্যাংগনা,
 তবু দাড়াইল মাথা তুলি ।
 গৃহলক্ষী হয় রমণী, অবজ্ঞা করিবে যিনি,
 তিনি বটে সমাজ ধাতক ।
 সংসারে রমণী রত্ন, যে না বুঝে তার যত্ন,
 সমাজে বাস করা অনর্থক ।
 হিন্দু মুসলিম যবকগণ, রুখে দাঁড়াও সর্বজন,
 নারী স্বাধীনতা দিতে হবে ।
 আন্তর্জাতিক মেয়েরাই, সকল স্বাধীন দেখা যায়,
 এই দেশ কেন পিছুপা হয়ে রবে ॥

২৭।৫৪, চট্টগ্রাম জেল ।

[১৯ একালের সমাজ কবিতা]

একাল সমাজ ব্যবস্থায়, অনাহারে দিন কাটায়,
 পথেঘাটে গরীবের ছেলে ।
 যদি শিক্ষা দীক্ষা পায়, এই সকল ছেলেরাই,
 আইএসসি পাশ না করবে কে বলে ।
 বড়লোকের ছেলেরাই, দিনে তিন বেলা টিফিন খায়,
 মাছ মাংস ঘি পোলাও কত ।
 গরীব লোকের ছেলেরাই, পেটভরে ভাত নাহি পায়,
 অস্তি মাংস সকল মজ্জাগত ।
 সমাজে দুর্বল যেই, মহা অপরাধী সেই,
 নির্যাতন নিত্য সহচর ।
 তার সত্য কথা মিথ্যা হয়, মনক্ষুন্ন সব সময়,
 কেহ লয় না দুঃখের খবর ।
 ঘুষ দিলে চাকুরি মিলে, মরুভূমে জোয়ার খেলে,
 এই একালের সমাজের গুণ ।
 স্বাধীন স্বভা নিয়ে, আছে কত দুঃখ গয়ে,
 কাচা বাঁশে ধরিয়াছে ঘুণ ।
 সমাজে গরীবের ছেলে, যেতে পারেনা স্কুলে,
 মুখতা জীবনের সহচর ।
 যৌবন প্রারম্ভে প্রায়, অসৎ সংগে কাল কাটায়,
 চৌধুরী করে নিরন্তর ।
 অভাবে স্বভাব নষ্ট, তার ফলে কারা কষ্ট,
 বড় চোরের সঙ্গে মিশে জেলে ।
 সাজা শেষে বাহির হয়, ডাকাতির ব্যবসা লয়,
 অশিক্ষায় এই ফল ফলে ।

সমাজের নীতি দেখে, মরি আমি মন দুঃখে,
 একালে সমাজের কর্মধারা ।
 নিরিহ লোক শাস্তি প্রায়, অপরাধীর স্নানাম গায়,
 গুণাদলে পুরস্কৃত করা ।
 কলংকিনি যারা দেশে, লক্ষ্মীর বেদিতে বসে,
 গতী যারা পদদলিতা ।
 অসতের সমাজের মান, সৎ এর নিত্য অপমান,
 কি বুঝাব এই সমাজের কথা ।
 ঈদ কি দশমী দিনে, মুসলমান মুসলমানে,
 হিন্দু হিন্দুতে আলিঙ্গন ।
 ধর্ম আইনের মর্ম মতে, স্বজাতির ভাইদের সাথে,
 এই প্রথা আছে চিরন্তন ।

৩-৭-৫৪, চট্টগ্রাম জেল ।

[২০ শিক্ষাই আলো]

শিক্ষা জীবনের মূল, একথাটা নির্ভুল,
 শিক্ষা শিল্প কৃষি এই তিন ।
 এই তিনটি উন্নতি বিনে, শাস্তি নাই কোনদিনে,
 রাষ্ট্র উন্নতি হয় না কোন দিন ॥
 গণতান্ত্রিক দেশ যত, শিক্ষায় শিল্পে উন্নত,
 অবৈতনিক বি,এ, এম,এ, পাশ,
 বৈজ্ঞানিক সারের জোরে, জমি উর্বরা করে,
 কলের লাংগল টেক্টার দিয়ে চাষ ॥
 নানা শিল্পে প্রসার করে, রুজি পায় মজদূরে,
 স্বাধীন দেশের চাল-চলন এই জানি ।
 আমরা স্বাধীন হয়েছি, হতাশায় দিন কাটাইতেছি,
 তিলে তিলে জীবনের ক্ষয় জানি ॥
 কোন মেধাবী ছেলে, পড়িবার ইচ্ছা হলে,
 অর্থ কষ্টে পড়িতে না পারে ।
 দেশের হিন্দু মুসলিম গণে, যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যদানে,
 আইএ, বি,এ, পাশ করান যায় তারে ॥
 দেশের লাঠি একের বোঝা, এই কথা বুঝতে সোজা,
 হিন্দু মুসলিম যার ছেলে হোক ছাত্র ।
 এক গ্রামে দু'হাজার ঘর, একখানা সিকি দিলে বহুতর,
 একটি ছেলের পড়ার খরচ মাত্র ॥
 বহু ছেলে গরীব ঘরে, আজীবন জন্ম ধরে,
 দৈন্যতা পীড়নে শিক্ষাহীন ।
 কি শিখবে লেখাপড়া, কালে গেছে বাবা মারা,
 অনুভবে সদা মুখ মলিন ॥
 ছেলে যদি শহর চিনে, পেটের ক্ষুধার কারণে,
 কোন বাবুর বাসায় চাকুরি লয় ।
 এটো ধোয়া আর বাসন মাজে, বাজার করে মাঝে মাঝে,
 কৈশোর এইভাবে গত হয় ॥

তারপর যৌবন ভরপুর, সেজে বসে ক্ষেতমজুর,
 সারাজীবন দৈন্যতায় ঘেরা।
 তারপর সর্বহারা দলে, ভতি হয় দলে দলে,
 স্বাধীন দেশের এইত চেহারা ॥

৫।৭।৫৪, ঢাকা জেল।

[২১ গান তাল খেমটা]

দেশের ভাইরে দেখছনি ভাই আজব দেশের কারখানা,
 কেহ বেজা কেহ তাজা কেমন মজার দেশখানা।
 দুইভাই হয়ে একভর, সাধ করে উঠালাম ঘর,
 রক্তক্ষয়ের করা যায় না তুলনা।
 হঠাৎ পশ্চিম হতে বাতাস এল, ঘরের চাল বেড়া উড়িয়ে নিল,
 শূন্য ভিটা পড়ে রইল বসত করা হলনা ॥
 বিএ পাশ করেছে ছেলে, দৈন্যতা খণ্ডিবে বলে,
 পিতামাতা করে কত কামনা।
 ইন্টারভিউ দিতে যায়, পীরের গিনি মানো যায়,
 ঘরে এসে সন্ধ্যা বেলায় কয় চাকুরি জুটল না।
 সময় আছে মংগল চাও, ভাইয়ের পাশে ভাই দাড়াও
 পরের উদ্ধারিত কান দিওনা।
 তোমার আমার বিচ্ছেদ এলে, শোষকের হুবিধা মিলে,
 বুদ্ধির ভুলে যাতাকলে মাথা দিতে যেও না ॥
 ভাত হলে তরকারি নাই, এমন দেশে কাল কাটাই,
 দুখের কথা বুঝলে কেহ শুনেনা।
 কেবল দায়ি করি কর্মফলে, এই দারুন দৈন্যতা তালে,
 কি আছে তা চুকু খুলে,
 কেহ কোন দিন দেখল না ॥

১৮।১।৫৫, চট্টগ্রাম।

[২২ আদর্শ মানব ছড়া]

মানব দানব উভয় একাকার গুণ কর্মে পরিচয়
 হাত-পা বিশিষ্ট মানব আকৃতি প্রকৃতি মানবের নয়।
 নিজ স্বার্থ আদায় করিতে পর পীড়া দানে যেই
 মানব রূপেতে জন্ম নিল ভূতলে প্রকৃত দানব সেই।
 মিথ্যা যার জীবন সহচর মিথ্যায় পুলক গাঁথ
 পরশ্রী কাতর থাকে নিরন্তর হিংসা পরিপূর্ণ চিত্ত।
 মুখে মিষ্ট বুলি অন্তরে গরল পর দোষে দৃষ্টি রাখে
 ক্ষমা শূন্য হৃদয় তাহার কলছে আনন্দে থাকে।
 মানুষ হইয়া মানুষের উপর যেন করে অত্যাচার
 বসুন্ধরা অনিচ্ছা সত্ত্বে বহিছে তাহার ভার।
 মানবে সম্ভবে যোগী ঋষি মুনি আউলিয়া আশিয়া যত
 রামকৃষ্ণ যিশু বুদ্ধ মহম্মদ সকল মানুষের মত।
 মানব কল্যাণে জগতের হিতে নিরাতন নিপীড়ন সহি
 মানব আদর্শ স্থাপন করিল মানবের নীতি কহি।

মানব সবাই যেন ভাই ভাই কেহ নহে কারো পর
 প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাহায্য তারে সংসারে করেছে ঘর ।
 সত্য বিচ্যুত হয়না কখন সত্য পরম ধন
 তুচ্ছ প্রাণ রাখিবে সত্য সকল দিয়ে বিসর্জন ।
 সত্য মানবের জীবনের সাথী সত্য মানব রক্ষী
 সত্যশ্রয়ীর ঘটনা পতন ইতিহাস তার সাক্ষী ।
 সহনশীলতা ধর্ম বিশ্বাসী ত্যাগ ব্রতী সর্বদাই
 মানব প্রেমিক মানব কল্যাণে জীবন কাটিয়া যায় ।
 সৎ উপদেশ দান সৎ কাজে রত সদা সদালাপী যেই
 মানব সমাজে মানবের সাজে প্রকৃত দেবতা সেই ॥
 ৭।১১।৫৫, নিজবাড়ী ।

[২৩ কৃষি অবস্থা]

সুজলা সুফলা মোদের পূর্ব পাকিস্তান
 শতকরা আশিজন কৃষক হিন্দু মুসলমান ।
 তিনতনু কৃষভার দেহ ছিন্ন ভাতে
 কন্টক কাঁপে দেহ কাপড় নাই শীতে ।
 কাঁচামালের যোগানদার এই কৃষকদল
 দেশের মেরুদণ্ড কৃষক মজদুর সকল ।
 এক বাক্যে সকলে বলে সদা শুনতে পাই
 কাজে দেখি স্নানজর সেই দিক কারো নাই ।
 বিদেশি শিল্পেতে দেশ ভরপুর হল
 প্রতিযোগিতাতে দেশের কারিগর হটিল ।
 ধনীরা মুনাফা করে যাদের কাঁচামালে
 বিলাসের সামগ্রী হয় যাদের শ্রমের ফলে ।
 তিলে তিলে মরে তারা পেটে অনু নাই
 রোগশয্যায় গড়ায় তারা ঔষধ নাহি পায় ।
 দাতব্য চিকিৎসালয় গ্রামে গ্রামে হয়
 রোগী গেলে বাহির হতে ঔষধ কিনতে কয় ।
 এগ্রিকালচার অফিসেতে পাবে বীজ ধান সার
 চিন্তা করে কেবা দেখে কিছু চাষার ।
 সারের জন্য গেল চাষা অফিসারে বলে
 সারের ঠেক খালি এখন আবার এলে পাবে ।
 এই সব গরিমসি কৃষকের দিন গত
 দুঃখী জীবন নিয়া চাষি আর পারে কত ।
 তেভাগা আন্দোলন চাষারা করিল
 দিনাজপুরের চাষিগণে কতকষ্ট পাইল ।
 জমিদার চাষি মারতে সরকারের আশ্রিত
 শিবরাম সমিরউদ্দিন দোহার জীবন হত ।
 আধিবর্গা পুথা চলে পূর্ব পাকিস্তানে
 ঘাস বিছালির ভাগ পায়না বর্গা চাষাগণে ।
 ধানের আধা ঘাস বিছালি মালিকে সব রাখে
 মালিক বুঝে চাষির বলদ বাতাস খাই থাকে ।

বলদ দুইটা দেখতে যেন অস্ত্রি চর্মসার
এই কৌশলে চাষি ধ্বংস পূর্ব বাংলার ।
উন্ময়ন হবে দেশের পত্রিকায় যায় শোনা
ভেবে দেখুন উন্ময়নের কি স্তম্ভর নমুনা ॥
১৫৮৮৬১, গোমদন্তী ।

[২৪ গান তাল ঠুমরী]

কি দারুন বন্যা দেশে আসিল, দেশ জ্বালাইল ।
এক সংগে নয়টি থানা জলের তলে ডুবাইল ॥
দেশ জ্বালাইল ।
বেরাজ্যা সাজিল মানুষ ঘর বাড়ী হারাই আরও গরু ছাগল নাই ।
বীজধান বলদ ঘরের কথা মেস্বারদের জানাইল ॥
দেশ জ্বালাইল ।
মরাগরু পাইলে শকুন যেমন খুশি হয়, তেমন মেস্বার মহাশয় ।
মনে মনে মেস্বারে কয়, এই সুযোগ খোঁদায় দিল ॥
দেশ জ্বালাইল ।
যার জন্য আসিল সেত নাহি পায়, বেশির ভাগ মেস্বারে খায় ।
গরীবের হক বড় মানুষ খায়, ভোটে এই ফল ফলিল ॥
চোখে দেখল সবে বন্যার কাণ্ডের গুণ, যেমন কাঁচাবাণের ঘুন ।
হুশিয়ারে ভোট দিবা ভাই, সামনে আবার ভোট এল ॥
১৭১০৮৬২, গোমদন্তী ।

[২৫]

শুনছনি ভাই শুনছনি, পত্রিকা খান পড়ছনি
পরিবার পরিকল্পনার খবর পাইছনি ।
রোজগারে খরচ না সারে, কে যোগাইব ভাত পানি ॥
ভাবিয়া করিলে কর্ম স্রব্বের লক্ষণ, না ভাবি কাজ করলে ঘটে পশ্চাতে শোচন ।
ডাক মহাপুরুষের বচন ভাবি চিন্তি চাইছনি ।
পুত নাতিতে ঘর ভরাই যবে জায়গা নাই
রোজগারে খরচ না সারে এখন কি উপায় ।
ঈমানদারী কথা কও চাই পেট ভরি ভাত খাইছনি ॥
বাঘের একটা বাচ্চা হইব বার বছর পর
হেই দরোয়াপ উঠি গেছে মানুষের ভিতর ।
মাইন্সর বাচ্চা বছর বছর কিয়ে পাইয়ে কি জানি
মানুষের দুর্গতি দেখি গর্ভর্নমেন্ট কয়
জন্যনিয়ন্ত্রণ বিনে থামান যাইত নয় ।
যদি আইনের বাঁধন শক্ত না হয় ডাক দোহাই মানিবনি
পাকিস্তানী ভাই ভগিনি হুঁশে চলিবা
যে দিকে শান্তি মিলে সেই দিকে যাইবা ।
যদি ইসারাতে না বুঝিবা ভাংগি কইলে হৈবনি ॥

[২৬ দেশপ্রেমমূলক শিক্ষা সংকট]

প্রাইমেরী শিক্ষার মাথা, আইএ বিএ পরের কথা,
 দেশে কেহ ভাবিয়া নাহি চায়।
 যেই দিকে ফিরে চাই, শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত নাই,
 দেশের লোকের হবে কি উপায় ॥
 প্রাইমেরী স্কুল যত, চলেনা আর রীতিমত,
 মাস্টারের বেতনে না পোষায়।
 প্রাতশয্যা ত্যাগ করি, করতে যায় প্রাইভেট টিচারি,
 ঘরে ফিরে রাত দশটায় ॥
 একেত অল্প মাহিনা, মাসান্তেও পাওয়া যায় না,
 স্কুল চালায় উপবাসে থাকি।
 শিক্ষা বেচে স্কুল চলে, এই কথা সকলে বলে,
 সেই আশায় বসে কয়দিন থাকি ॥
 প্রাইমেরি মাস্টারে, খরচ সামলাতে নারে,
 কেমনে ছেলে পড়াবে আর।
 পেটের জ্বালায় দুই বেলায়, লোকের বাড়ী বাড়ী যায়,
 মধ্যাহ্নে হয় স্কুল চকিদার ॥
 লংকা লবণ মাছ তরকারি, সকল দুর্মূল্য হেরি,
 ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে গিয়াছে।
 বিপ্লবী সরকারে, শিক্ষার দিক দৃষ্টি করে,
 মাস্টারকে ভাতা দিতে পারে ॥
 গরীব যত মাস্টারগণ, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ,
 চালাতে সর্বদা ব্যাকুল চিত্ত।
 ম্যাট্রিক যিনি করে পাশ, ভাতের জ্বালা হা হতাশ,
 সমাজের এই ত চরিত্র ॥

১০।৪।৬৪, চট্টগ্রাম।

[২৭ গান তাল খেমটা]

মনের মিলন না হলে ভাই মুখে মিলন হয় কি বল,
 শোষণ ধনীর হাতে পরে, আমাদের সর্বনাশ হল।
 মিলনে শান্তি পাবে, বিবাদে উচ্ছন্ন যাবে,
 বিচার করে দেখুন এবে, এই দুটুতে কোনটি ভাল।
 লুটতরাজ হত্যা অত্যাচার, এই একটা জঘন্য ব্যাপার,
 কায়েমি কার এই সংসার, সেই কথাটা বুঝে চল।
 দাংগা হাংগামা করে, পথে ঘাটে মানুষ ধ্বংস করে,
 দেশের সুনাম নষ্ট করে, কি লাভ হল বল বল।
 দেশের পাংগলের পাংগলা কথা, মিলন ছাড়া শান্তি কোথা,
 পাষণে ভাংগিলে মাথা শান্তি কি তায় লাভ হইল ॥

১০।৫।৬৪, গোমদণ্ডী।

[২৮ চৌষটি সনের নির্বাচন]

ভোট হবে ভোট হবে বলে দেশে পইল সারা
 মিস ফাতেমা জিনুহ ইলেকশানে খাড়া ।
 বিরোধী দলীয় গণের মনোনয়ন পেয়ে
 মাদারে মিল্লাত দাড়াল গণশক্তি নিয়ে ।
 গণতন্ত্র কায়েম হবে বলে জোর গলায়
 খোদা মানুম নির্বাচনে ফল কি দাড়ায় ।
 কেহ বলে মেয়ে মানুষ কত শক্তি ধরে
 রাফ্ট পরিচালনায় পুরুষ কয়জন পারে ।
 কেহ বলে বিবি আয়েসা রোকেয়া ইত্যাদি
 চাঁদ সুলতানা ঝাঁসির রাণী এলিজাবেদ আদি ।
 অনেক মেয়ে রাজ্য শাসে রয়েছে প্রমাণ
 নানাভাবে নানা মতে দিতেছে বিধান ।
 কায়দে আয়ম কষ্ট করে পাকিস্তান আনে
 পাক জায়গা পবিত্র স্থানে অশুভ ভাব কেনে ।
 নাথুরামে গুলি করি গান্ধির জীবন শেষ
 আকবর হায়দার আততায়ী দয়ার নাই লেশ ।
 উজিরে আযমে খবংস আকবর হায়দার করে
 খান সাহেব ছুরিকাহত খুজি পায়না তারে ।
 প্রফেসার নোভাক দাংগায় মারা যায়
 হিন্দু কি খৃষ্টান কেহ ভাবি নাহি চায় ।
 একের দোষে অপর মরে স্বাধীন পাকিস্তানে
 সভা দেশ বলে লোকে বলিবে কেমনে ।
 সাম্প্রদায়িক দাংগা হয় যাহার কৌশলে
 তারা আজ গণ্যমান্য সর্বলোকে বলে ।
 নিরীহ লোক মারা যায় শিশু নারীগণ
 কে জোগায় ভেবে চায়না এই দাংগার ইন্ধন ।
 গরীবে গরীবে যদি এই দুঃখ বুঝিত
 রামের দোষে শ্যামের দণ্ড কদাপি না হত ।
 বাস্তব্যাগি হিন্দু মুসলিম এই দুঃখ নিয়া
 দাংগার আগুণ জ্বলে ঘুমিয়া ঘুমিয়া ।
 যইবার হয়ে গেছে এই শপথ নাও
 সকলে মিলে সাম্প্রদায়িক বন্ধ করে দাও ॥

৮।১০।৬৪, গোমদণ্ডী ।

[২৯ অভিনন্দন]

ভাসানী যখন ইউরোপে, বহিখান বাজারে দেখি,
 অভিনন্দন দিতে এলেম পুলক চিহ্নে, হইয়ে অত্যন্ত খুশি ।
 সাদরের গ্রীস্মো দিলে সকলের, ভাল বাসিতে হবে,
 অমৃত বৃক্ষে বিষ ফলিবে কে জানে এমন হবে ।
 ইউরোপে জন্মা ধরিয়া, এশিয়ায় প্রকাশ হলে,
 সাতটি বৎসর ভুলের সাগরে, ডুব দিয়ে কাটিয়ে দিলে ।

প্রকৃতি রাজ্যে সবাই গতিশীল, স্থবির কৈ কি রবে,
 সত্যের অপলাপ ঘটিবে যেইদিন, ইতিহাস মিথ্যা হবে ।
 ভুলে নাই ভুলিবে না কভু জনতায় তোমার বাণী,
 সেখানেতে তপন ভুমিও তেমন প্রকাশ হয়েছে শুনি ।
 কে করিবে তব কণ্ঠ রোধ, পারিবে কি কোন কালে,
 পাংশু আচ্ছাদিত পাবক যেমন, বায়ুর পরশে জ্বলে ।
 অসংখ্য কলেবর পরিগ্রহ করে, এই স্বাধীন পাকিস্তানে,
 প্রতি ঘরে ঘরে তোমার স্থান হউক, এই কাম্য সদাই মনে ॥
 ৪।৬।৬৫, গোমদণ্ডী ।

[৩০ ভোটের গান]

ছননি ও গন্যার বাপ ভোট দিবার কই পাঠাছে,
 ভোট হবে ভোট দিতে যাইও এই কথা কই চোল পিটাছে ।
 আমার ভোটে মেঘার হইয়া আমার রক্ত চুমি খায়,
 হক ইন্‌ছাপে কও তা দাদা তারে নি ভোট দেওয়া যায় ।
 ভোট দিয়াছি বারে বারে
 আমার কি উপকার করে,
 আর একবার ভোট দিতাম তারে মোরে নি পাগলে পাইছে ॥

ভোটের সময় হলেই তাই গরীবের গায় হাত বুলায়,
 তারপর গরীব বাঁচে মরে মিঞায় নি আর ফিরি চায় ।
 গাড়ী করি যেতে তাই
 সালাম-আলকি দিয়া চাই,
 মিঞার মুখে হাসিত নাই বোধ করি কি অস্বস্ত আছে ॥

আইন সভায় মেঘার হল শুন একটা খোঁজ খবর,
 তিন বৎসর পর উঠা গেছে পাঁকা এক তেতলা ঘর ।
 দরোয়াপ করত তাই
 এত টাকা কোথায় পায়,
 পদ্মা টেবিল বিজলি বাস্তি রেডিও মটর এনেছে ॥

ভাবি চাও দেশের ভিতর গরীবের হিত করে কে,
 সব মিলে চল এবার ভোট দিব তাহাকে ।
 দেশপ্রেমিক যদি হয়
 জেল ফাঁসির নাহি ভয়,
 তারা যদি মেঘার হয় গরীব গুন্যার পরাণ বাঁচে ॥

[৩১]

ইণ্ডিয়া একি কাণ্ড লাগাইয়ে,
 মাউন্ট বেটনের রোয়েদাদ কিল্যাই উল্ভাইয়ে ॥
 মোদের পাশাপাশি দেশ,
 মিলি মিশি সহ-অবস্থান করে দিয়ে শেষ,
 পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ কি বুঝিয়া যোচাইয়ে ॥

মুসলমান গরিষ্ঠ অঞ্চল হবে পাকিস্তান,
 সেই হিসাবে কাশ্মীর মোদের রয়েছে প্রমাণ।
 নেহেরুর জীবন অবসান শাস্ত্রীতো নীরব রইয়ে ॥
 যেদিন জিনাজি ওফাত,
 জোর করে করিল দখল মোদের হায়দরাবাদ।
 তবু তাদের মিটেনি স্বাদ, বহবার হানা দিইয়ে ॥
 নুন নেহেরু যেই চুক্তি ছিল,
 বেরুবারি দিবার কথা একদম ভুলিয়া গেল।
 গ্রাহাম ডিকসন কত এল, তারাও কি রায় দিইয়ে ॥
 কেনেডি কি বুঝ বুঝিল,
 ইণ্ডিয়ায় রস-সত্তার বহুত যোগাইল।
 কাজের মত ফল ফলিল উপরওয়াল চাই রইয়ে ॥
 দুনিয়ায় তাই মিলে মিশে থাকন বিনে আরত শান্তি নাই,
 সহ-অবস্থান মধুর শব্দ ভাল মাইনুষে কই গেইয়ে ॥

[৩২]

জোর কদমে এগিয়ে যাও ভাইরে বীর যোয়ান,
 দুয়ারে এসেছে দুঃমন নিকাল তার জান,
 ভাইরে নিকাল তার জান।
 তৌহিদের তলোয়ার, চমকে বিজলি ধার,
 আওয়াজ বালত বালতকার শত্রু কম্পমান। (ঐ)
 হিন্দুস্থানি সৈন্য ভারি, তাতে কি আতংক করি,
 মোদের একজনে হাজারজন মারি, নাই তার নাম নিশান।
 ইসলামের পূর্বাপর নীতি, জেহাদে আসেনা ভীতি,
 বড় বড় জংগ জিতি, উড়ায় জয় নিশান। (ঐ)
 কামান বন্দুকের গুলি, অন্য দিকে যাবে চলি,
 আল্লাহ আকবর বলি, ঠিক রাখ ঈমান ॥ (ঐ)
 এইটা মানবতার যুদ্ধ, গণতন্ত্রের হয়ে বাধ্য,
 করতে হবে যথাসাধ্য খোদা মেহেরবান ॥
 আসমান বদলে ফেরাউনে-নমরুদের লড়াই
 মনে ভার থেকে যেত, হিন্দুস্থানে শাস্ত্রী বেইমান ॥ (ঐ)
 আঠার বছর গত হতে ডিকসন গ্রাহাম হল গেল,
 রাষ্ট্রসংঘ কি করিল, কর অনুমান ॥ (ঐ)
 কন্সার্ট্রিয়াম বৈঠক দিতে, গরিমসি কেন তাতে,
 বাহির হতে শংখ হাতে, আসুক পাকিস্তান ॥

[৩৩]

ভাইসব নয় বছর গত হইয়ে,
 বড়মিয়া মজা উড়াই আরামছে রইয়ে।
 বিনা রক্তপাতে বিপ্লব করি দেশত গুণাম জোগাইয়ে ॥
 ভাইসব বেলুচির খবর, ঈদর জমাতে বোমা চালিল মছল্লির ওপর,
 সতর জন মানুষ মরি গেল, সাত জনরে ফাঁসি দিইয়ে ॥

ভাই হুশে নকুলার বিনা রক্তপাতে বিপ্লব কি করি বুঝাব
 ইচ্ছামত কারবার চালার ডিক্টেটারশীপ পাইয়ে ॥
 টেক্সর পূর্বপুরুষ উনত্রিশ জন ভাই,
 টেক্সর পুত্র টেক্সর নাতি দেশত জাগা নাই।
 জন্মানিয়ন্ত্রণ মাইনুষের লাই, টেক্সরলাই কড়ে গেইয়ে।
 মোরা সব সময় দোষী,
 জোয়ালের তলে কল্লা দিলে দাদা বড় খুশী।
 যদি নড়ি চড়ি গলার ফাঁসি, ফাশিবার বুদ্ধি লইয়ে ॥
 শুন যত দেশের ভাই,
 ভিজা কাঁথা পিড়ত বান্ধি থাকার সময় নাই।
 আন্দোলনে পড় ঝাপাই জানর লাই আর কী রইয়ে ॥

[৩৪ গান]

মাতৃজাতি সব আর কেন নীরব উঠ-উঠ সবে জাগিয়া,
 উষোধন মধ্যে ভৈরবি যন্ত্রে আকাশ বাতাসে ধ্বনিয়া।
 জগতের হিতার্থে পুজিত রমণী, পুরুষ প্রধান সমাজ তাই এত গ্লানি।
 নারী নির্যাতন দিবস যামিনী, চলে যুগ যুগান্তর ধরিয়া।
 আন্তর্জাতিক যত মেয়ে যায়, পুরুষের সনে সম মর্যাদায়,
 জাতির সংকটে রাইফেল চালায় নারী বাহিনী সাজিয়া।
 ষাইট হাজার গ্রাম পূর্ব বাংলায়, প্রতি গ্রামে যদি এক মেয়ে দাড়াই,
 নারীদের প্রভাবে অসাধ্য সাধিবে, বন্ধ দুয়ার যাবে খুলিয়া ॥

[৩৫ নারী নির্যাতন কবিতা]

আমাদের সমাজের নারী, রেখেছি বন্দিনী করি,
 দাসিপনা বিনে নাহি জানে।
 চীন জাপান রাশিয়ায়, মেয়েরা বিমান চালায়,
 দেখে শুনে চেতনা নাই কেনে।
 মেয়েরা কি করবে আর, পুরুষগুলি যে গোঁয়ার,
 বের হলে বলে নষ্টা দ্রষ্টা।
 নারী জাগরণ বিনে, মুক্তি নাই কোন দিনে,
 কেহ নয় ভবিষ্যত দ্রষ্টা।
 সাধারণ ঘরের মেয়ে, আছে যত দুঃখ সয়ে,
 সেদিক কেহ ফিরে নাহি চায়।
 দিবা নিশি নির্যাতন, তবু সহ্য্য বদন,
 একমুঠ ভাত আর কাপড়ের আশায়।
 শ্রমের আর শাওড়ী, স্বামী ভাস্কর অধিকারী,
 কথায় কথায় গল্পনা দেয় কত।
 শ্রম করে সারা বেলা, তার পুরস্কার অবহেলা,
 ভোগ্য বস্তু পণ্য দ্রব্যের মত।
 উঠান বাড়ু গোয়াল ঘর, দিতে হয় অষ্টপ্রহর,
 ধান শুকান ধান ভানা গোলায় তোলা।

বাস বিছালি গরুর তরে, মাথায় করে আনে ঘরে,
 তবু আদর পায়না দুই এক তোলা ।
 ভিজা লাকরি চুলার ধারে, ধোয়ায় চোখ অন্ধ করে,
 গ্রীষ্মেতে গরমে রন্ধন ।
 বাসন মাজে বাটনা বাটে, উৎসাহে আপ্রাণ খাটে,
 স্বাদ হয় কিনা কেমন ।
 তবু সকাল বিকাল গালাগালি, মা মাসি বাপকে তুলি
 নিবিকারে সহ্য করে চলে ।
 মার খায় মাঝে মাঝে, চোখের জলে বক্ষ ভিজে,
 কি সাধ্য মুখ তুলে কথা বলে ।
 অত্যাচারে অবিচারে, প্রতিবাদ জানাতে নারে,
 এইতো সমাজের পরিণতি ।
 ঘর সংসার রাখিতে ঠিক, নজর থাকে চারিদিক,
 অসুখে শুশ্রুসায় থাকে ব্রতি ।
 শীতে দারুণ কষ্ট হয়, আঁচল জড়িয়ে রয়,
 দেহ কাঁপে ঠক ঠক করে ।
 পুরুষের পায় জুতা গায় শাল, এই ভাবে যায় চিরকাল,
 কি দোষ করেছে বলো নারী ॥

[৩৬ বিধবা বিদ্বা কবিতা]

সমাজে বাস করে যারা মোড়ল মাতঙ্গর ।
 কেমনে সমাজ চলে রাখেনা খবর ॥
 সত্য ত্রেতা স্বপ্নের গত ২ বলব কত হল পরস্পর ।
 সতীদাহ প্রথা ছিল ভারত ভিতর ॥
 প্রথমে ছেলে হলেই ২ গংগাজলে করত বিসর্জন ।
 এইভাবে ধর্মে রত ছিল হিন্দুগণ ॥
 লর্ড বেংটি-এর কালে ২ ডেকে বলে যত হিন্দুগণে ।
 জল আগুনে মানুষ মারি ধর্ম হয় কেমনে ॥
 একি অবিচার ২ অত্যাচার কতু না করিও ।
 আইন মতে শাস্তি পাবে মনেতে রাখিও ॥
 তখন হিন্দুগণে ২ ভাবি মনে করিল বিচার ।
 ডাইল অমূল ঝোল ঘন্ট বিধবার আহার ॥
 পরণে সাদা ধুতি ২ কিবা ক্ষতি করে বার মাস ।
 দিবসে একবেলা খাবে রাত্রে উপবাস ॥
 এখন কলিকাল ২ বেসামাল নাহি ধর্ম ভয় ।
 ব্রূণ হত্যা ব্যাভিচার যেই সেইখানে হয় ॥
 এই সব মহাপাপে ২ ধরা কাঁপে ভূমিকম্পের বেগ ।
 রোগ শোক জাত্যন্তর নানান উদ্বেগ ॥
 নিয়ে কাল ধর্ম ২ বুঝ মর্ম কর্ম কর সার ।
 সহসা প্রচার কর বিধবা বিয়ার ॥
 নতুবা বিপদ ভারি ২ চক্ষে হেরি সমাজ নেতাগণ ।
 হিংসা নিন্দা অভিমান কর বিসর্জন ॥

মহান্না গান্ধির মতে ২ সবকাজেতে একতাটি চাই ।
 বিধবা বিয়ে বিনে আর মঙ্গল নাই ॥
 নতুবা দিন দিন ২ হবে ক্ষীণ আমাদের সমাজ ।
 প্রতি পদক্ষেপে মোরা নিত্য পাব লাজ ॥
 দেখ নারী মইলে ২ পুরুষ দলে দুই তিন বিয়া করে ।
 পুরুষ মলে নারীকূলে স্বামী লইতে নারে ॥
 সেইটি বিচার নয় ২ জুলুম হয় রমণীর উপর ।
 তিন চিনার লেবু তিজ্ঞ জানে চরাচর ॥
 নারীর স্বদিন এল ২ প্রভু দিল যুগ ধর্মের ফলে ।
 মাথা তুলি ঘোমটা খুলি হাটবাজারে চলে ॥
 এই সব কি পূর্বে ছিল ২ বল বল এখন দেখতে পাই ।
 জুতা পায় পায় খালায় খাওয়া ঘটি ধোয়া নাই ॥
 পৈতা শূন্য হোট্টেলে খানা ২ শাস্ত্রমানা কয়জন হিন্দুমান্নে ।
 বেল পাতা আর তুলসি পাতা তুচ্ছ যত দিনে ॥
 চা পাতার আদর বেশী ২ কসাইর খাসির মাংসতে সন্তোষ ।
 সকল কার্য চলে কেবল রাষ্ট্রী বিয়ায় দোষ ॥
 উষনা শাস্ত্রে বলে ২ পতি মইল বংশের কারণ ।
 নিয়োগ করিতে আদেশ দিলেন মুন্সীগণ ॥
 সর্বণে তাস বর্ণে ২ শাস্ত্রে বর্ণে নিষিদ্ধ নয় ।
 ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু বিদুর নিয়োগে হয় ॥
 ব্যাসের কি কম বুৎপত্তি ২ লিখে পুথি চন্দ্রবংশ সকল ।
 বিধবার গর্ভে উৎপত্তি করু পাণ্ডুকুল ॥
 করে বিধিমতে ২ নষ্টে মুতে বজ্রিতে পাতিত ।
 এই পঞ্চ পতিরণ্য শাস্ত্রেতে বিদিত ॥
 যৌবনে কামের জ্বালা ২ প্রাণ উথলা স্ত্রী পুরুষের করে ।
 ইন্দ্রিয় সংযম করি কয়জন থাকতে পারে ॥
 হলে অপগর্ভ ২ জাতে খর্ব লোকে জানাজানি ।
 পুলিশে তালাসে বাড়ী হলে হাসিল খুলি ॥
 তোলে প্রকাশ করি ২ বৌ ঝিয়ারি সবাইর মান তো যায় ।
 ইষ্ট বন্ধুর মুখটি মলিন ছেলে গরু খায় ॥
 কলংক জগৎ জোড়া ২ জন্মভরা দেখিলে রাস্তায় ।
 কেহ বলে এইত মোদের পণ্ডিত মশায় যায় ॥
 কেহ কয় ঘাটের নোকা ২ পারে ঠেকা আছে কি বিষয় ।
 এই সব লাজে বুঝে স্বখে যাচি ঝলটা লয় ॥
 কপালে তুলসি মাটি ২ তিলক কাটি বৈরাগিনী বেশ ।
 কোনটি হয় বারাংগনা লোক লজ্জার ক্লেষ ॥
 করুন বিবেচনা ২ এই গঞ্জনা নিবৃতি কারণ
 বিধবা বিবাহ দ্বরা করুন প্রচলন ॥
 শীঘ্র প্রয়োজন পুত্র ২ বিয়ার গুত্র তাই আয়োজন ।
 পুত্রার্থে কিয়ে ভায়া শাস্ত্রে নিরুপণ ॥
 বৃদ্ধ লোকের নারী মইলে ২ বিয়ের ছলে চুলেতে কলপ ।
 দুই দিন পর সে তারে করে লয় তলপ ॥
 ঘরভরা পুত্রনাতি ২ বৃদ্ধ পতি হয় বালিকার ।
 সমাজনেতা পণ্ডিতগণে করে নাই বিচার ॥

মনে কয় নিয়তির কর্ম ২ তার মর্ম একটু জানতে চাই ।
 বিধবার বিয়া লিখতে ব্রাহ্মার দোয়াত কলম নাই ॥
 আজ মন দুঃখে ২ যাই লিখে বিধবার বিয়া ।
 এই ভাবে চলিলে সমাজ হবে নিঃবংশিয়া ॥

গ ॥ বিবিধ :

এখানে পত্রস্থ বিবিধ বিষয়ক ৩৮-৪১ সংখ্যক রচনা স্মৃতিকথামূলক । অন্যান্য রচনা ব্যঙ্গাত্মক ।

[৩৭ আভিজাত্য ছড়া]

ভাতের সঙ্গে জাতের খেলা পূর্বাপর চলে,
 ভাবিয়া দেখেনা কেহ কি রহস্য মূলে ।
 ভাত খেলে জাত যায় পূর্ব হতে শুনি,
 আভিজাত্য বজায় রাখতে এই সকল কাহিনী ।
 যার ভাত তার জাত যদি আমরা পাই,
 অস্ত্রজের ভাত খাইলে যদি অস্ত্রজ হয়ে যাই ।
 এই নিয়া বাক বিতণ্ডা শুনি সব সময়,
 ব্রাহ্মণের ভাত খেলে কেন ব্রাহ্মণ নাহি কয় ।
 জেলেরা মাছ ধরে করে জীবিকা পোষণ,
 পেশকারি নাজিরি সব জীবিকা কারণ ।
 কাপড় ধুয়ে ধোপা বলে জাতি যদি হয়,
 পেশকার জাতি নাজির জাতি হয় না কি বিষয় ।
 দরিদ্র নীরিহ যত সমাজে আছে,
 ব্যবসা নাম দিয়ে জাতি তার মাথায় চাপায়েছে ।
 মুসলিম আনিলে পানি হিন্দু নাহি খায়,
 বোতলে পুরালে জল তবে খাওয়া যায় ।
 নাম হবে লেমনেড কি সোডা ওয়াটার,
 স্থির চিত্তে কেহ তাহার করে না বিচার ।
 ঘরের দরজায় রাখে পা ধোয়ার পানি,
 থৈয়ে বানালে কালি পায় বলি দানি ।
 প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধি করে জাত গেলে জাত পায়,
 অস্ত্রজের ভাত খেলে জাতটি কয় মাইল দূরে যায় ।
 কোথা হতে এল জাত শুদ্ধি হওয়ার পর,
 কোনখানে জাত প্রবাস করে জান কি খবর ।
 আপন আভিজাত্যটুকু রাখিতে বজায়,
 উচ্চ নীচ স্রষ্ট করা মূল অভিপ্রায় ।
 বেহারাগণ সিবিলা করিয়া পাত্রী আনে,
 তাদের কুষ্ঠি লিখা নাকি ভাবি মনে মনে ।
 পিতা পিতামহ তুল্য বড়সেতে খুড়া,
 কোন সভ্যতায় বিধান একাটি তাদের কান্দে চড়া ।

অন্ধ রোগা পঙ্কু হলে তবু শোভা পায়,
হাত পা আছে চক্ষু আছে কেন পাল্কি চড়ি যায়।
মানুষের অন্ধ চক্ষু খোলে জানি কবে,
এইসব জংলা কেটে গেলে বাংলা আবাদ হবে।
৬।১১।৩৩, গোমদণ্ডী।

[৩৮ চট্টল প্রশস্তি]

সুজলা সুফলা দেশ শান্তি সুখের একশেষ বার আউলিয়ার চট্টগ্রাম।
চট্টলে আছে যত সাধু সিদ্ধা অগুণিত একমুখে কত নেব নাম।
মা চট্টল জননী শান্ত ছায়িনি তোমায় সকলে ভাবে।
এয়ো নহিপাল তোমার ছাওয়াল তোমার কোলে শোভে।
পরাগল যাঁ আর ছুটি যাঁ কৃতি সন্তান তব কবি।
আলাওল আর দৌলত কাজি গিয়াছে তোমায় ভাবি।
কবি নবীন সেনে এক বাক্যে চিনে এই বাংলার জনগণ।
পলাশির যুদ্ধ পরলোক মুগ্ধ দেশপ্রেম হয় উদ্দীপন।
শশাংক সেনে শশাংকের সনে তুলনা করি লেখিলে।
আরও নবীন দাশ কবিত্ব প্রকাশ করেছে প্রতিভা বলে।
আশুতোষ চৌধুরী বহু যত্ন করি লুপ্ত গ্রন্থ যত ছিল।
সংগ্রহ করিয়া ভাষায় রচিয়া প্রচার করিয়া দিল।
লিখে ধ্যানলোক চট্টল আলোক জীবেন্দ্র দত্তের দান।
কবিত্ব উৎসবে বিপিন নন্দী লিখে সপ্তকাণ্ড বাদস্থান।
শ্রীকর নন্দী পূর্ব পুরুষ বিপিন নন্দীর ছিল।
কল্পনা কাননে কবিতা কুসুমে চয়ন করিয়া গেল।
সাহিত্যদরদ সাহিত্যবিশারদ অবদুল করিমে রাখে।
বৃদ্ধ বয়সে সাহিত্য রসে নিত্য সিক্ত হয়ে থাকে।
পল্লী কবি যত ছিল শত শত নবীন চক্রবর্তী সেরা।
অতি শুভক্ষণে কধুরখিল গ্রামে উঠেছিল শুকতারা।
আকবর আলী গোমদণ্ডী গ্রামে পুঁথি সাহিত্যিক ছিল।
মকবুল আহমদ বহু কবিতা রচনা করিয়া গেল।
আলি মিঞা গোমদণ্ডিতে যেমন কবিতার খনি।
প্রত্যেক কথায় কবিতার ছন্দ স্বভাব কবি বলে জানি।
মুক্তি বীরগণ ছিল অনেকজন সেরা যতীন্দ্র ব্যরিষ্টার।
ইসলামাবাদি কাজেমালি মাষ্টার কত বলি আর।
সূর্যসেন সূর্য সমতেজে তেজোয়ন বেশ আজি।
অনন্ত লোক বলে তারক নির্মল কালী দে অদ্যবধি।
আর বহু আছে কত লব নাম বই ভার হল ভয়।
চোল বাদ্যে গুয়ারন দাশ অর্পনা বাদ্য কর কয়।
পাটি কীর্তনে লক্ষ্মীচরণ গাইন খ্যাতি বহুতর।
নৌকা বাইয়ে পাইরল গানে সেরা ছিল সতাম সুল্লর।
গাজি গায়কে আজগর আলি চান মিঞা ওয়াদ আলি।
ফুলপাট গানে কালী সরকার প্রধান বলে বলি।
জারি গানে মহবত আলি কালু কর্মকার দলদড়ি নিবাস তার।
ছলিতে ছিল গগণ জলদাস প্রশংসা আছে তার।

ভিষক প্রধান নীলকমল আর জয়ন্ত দাসগুপ্ত জানি ।
 গুরুদাশ পণ্ডিত ভেষজ্যে পণ্ডিত নাম বিজ্ঞানী ।
 শেখ ফরিদ সুলতান বায়েজিদ চট্টগ্রাম আস্তানা পাতে ।
 শাহা আমানত পীর বদর সিদ্ধ চার তরিকাতে ।
 মাইজভাণ্ডার দরবার শাস্তির আধার ফকিরি সাধনা করলে বলে ।

হাইদগাঁওতে বড় পীরের দরগায় ফকিরকাজি কম জানি ।
 আল্লাগ্রামে কাজি সাহা ছিল সকলে এক বাক্যে মানি ।
 শাহ অছির রহমান ছিল চরণবীপেতে বাস ।
 সাহা হারবাংগিরি সিদ্ধ পুরুষ আর কিছু পূর্ব পাশ ।
 গুয়াবিল গ্রামে গুরুদাশ ফকির সর্বলোক জানা ।
 গোমদণ্ডী গ্রামে হরিকৃপান্দ সিদ্ধপুরুষ ঘোষণা ।
 ঘোল শহরে জগদানন্দ পরমহংস জ্ঞানবান ।
 জগদানন্দ মিশন নাম এখন কধুরখিল সমাবস্থান ।
 গোবিন্দ মহারাজ গোমদণ্ডী মাটি পবিত্র করে ।
 অনুদা বিশ্বাস বাঙালীর বাস গোমদণ্ডীতে জন্ম ধরে ।
 মেখল গ্রামেতে মহাপ্রভুর পার্শদ পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি ।
 গৌরান্দ দেবের ছিল কাছেরা মতেন নিরবধি ।
 সূর্যসেন অনন্ত টেগরা নরেশ কালী ।
 লোক নির্মল প্রভাস স্বদেশ রায় বীরবলে যারে বলি ।
 প্রিয়দা মোক্ষদা অর্ধেন্দু মধু বিনোদ দত্ত আদি যারা ।
 অমূল্য আচার্য কালীদে ইত্যাদি শ্রেতাংগ করেছে যারা ।
 বিনা দাস কল্পনা দত্ত আরও প্রীতিলতা ওয়াদ্দার ।
 বীরকন্যা চট্টলে সর্বলোকে বলে কৃতিত্ব ওই চট্টলার ।
 ৮।৩।৪৪, গোমদণ্ডী ।

[৩৯ পিছে ফেলা দিন]

আমার পূর্ব স্মৃতি জাগে মনে, আমার প্রথম জীবনে,
 আনন্দময় ছিল চট্টগ্রাম ।
 ভরাপুরা বনবান্য, বহু ছিল স্বনামধন্য,
 একমুখে কত লব নাম ।
 হিন্দু আর মুসলমান, মিলন ছিল প্রাণে প্রাণে
 পরস্পর সুখে দুখে সাথী ।
 উৎসবে কি পাল পার্বনে, নানারকম বাদ্যগানে,
 আনন্দে কাটাতাম দিবারাতি ।
 সেইদিন কোথায় গেল, দেশের কি দশা হল,
 যেই আনন্দ গেল আজ কোথায় ।
 ছেড়ে দিয়ে মানবতা, কেহ কয়না দেশের কথা,
 ক্রমে দেশ অধোমুখী যায় ।
 যেই রমণী সন্মান রাখিতে, মাথায় ধরে শব্দু নাথে,
 সাগর বাকিল রঘুনাথ ।
 নন্দলাল যার ধরে পায়, সেই মাতৃজাতির গায়,
 মিলেটারি গুণ্ডায় দিচ্ছে হাত ।

মনে মনে ভাবি তাই, মানুষ আর মানুষ নাই,
 নিমুস্তরে নামিয়া গিয়াছে।
 লোভ লালসা সর্বদাই, দেশের প্রতি দৃষ্টি নাই,
 নোটের ফেরে বাঙালী পরেছে।
 নোটকাগজ টাকা কড়ি, পাকাবাড়ী জমিদারি,
 সত্তর আশি বৎসরে বেশী নয়।
 দেশের দেশের হিত করে, সেই মানুষ মরণ পরে,
 কীতিনিয়া অমর হয়ে রয়।
 চন্দ্রসূর্য যতদিন, সেনগুপ্ত নাম ততদিন,
 ঘোষিবে বশ এ সোনার বাংলার।
 তাই বলি বন্ধুগণ, করুন সবে প্রাণপণ,
 দেশ যাতে প্রগতিমুখী যায়।
 শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্পে, সকলের উন্নতি কল্পে,
 আত্মপূর না করি বিচার।
 এক থাকি ভাই ভাই, হোক না আর ঠাই ঠাই,
 জাতি ধর্ম থাক য়েই যাহার।
 একে আগি বয়ঃবৃদ্ধ, দেশের জন্য হয়ে বাধ্য,
 দুঃখের সহিত করি আবেদন।
 স্বদেশের ভাই বোনদের কাছে, বলবার আমার দাবী আছে,
 পল্লী কবির এই নিবেদন ॥
 ৭।১১।৪৬, গোমদণ্ডী।

[৪০ ধর্ম সভায় ভাষণ]

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, উপস্থিত সদ্ব্যজনমণ্ডলী, প্রিয় ছাত্র মা-বোনগণ।
 বড় আশা নিয়ে প্রাণে এসেছি সভার স্থানে করিতে অভিনন্দন।
 আজ এই পুণ্য দিনে স্ববীভক্ত সর্বজনে এই সভায় হয়েছেন মিলিত।
 আবাল বৃদ্ধ বনিতায় গুরু জ্ঞানে এই সভায় সবার কাছে মাথা করি নত।
 যা দেখি ব্রহ্মাণ্ডময় গুরু বিনে কেহ নয়, গুরু ব্রহ্মা প্রভুর মূলের কথা।
 গুরু বিশ্বাস হল যার তার চরণে নমস্কার মানুষরূপে সেইত দেবতা।
 অস্বীকার করিবার যোগ্য নাই।
 গৃহস্থ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী পরস্পর মন কষাকষি দেখে মনে বড় দুঃখ পাই।
 মানুষ বাল্যকালে যাহা শুনে বিকাশ করে যৌবনে সেই সংস্কার আজীবন রয়।
 মূল সত্য চাপা পরে উপলব্ধি করতে নারে স্বরূপ উদয় নাহি হয়।
 দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ সাকার কি শূন্যবাদ নিজের সংস্কার সত্য বস্তু জানে যেই।
 অন্যের সংস্কার ভুল বুঝতে নারে সত্যের মূল হিংসা ঘেষে ভাসে সেই।

[৪১ লোকসংস্কৃতি]

লোক সংস্কৃতি চাঁটগায় অন্তর্মিত হল প্রায়,
 চারণ ভাটে পল্লীগ্রামে আর কবিতা না গুনায়।
 বাউলের একতারাও গুনিয়া টংকার চলে গেছে বহুদূর,
 লক্ষ্মী চরিত্র বহুরূপী সাজে গ্রাম ছিল ভরপুর।

নৌকায় পাল তুলে মাঝি মাল্লারা শারি গাইত সুখে,
 হেইও হো হেইও হো বদর বদর হালদা কর্ণফুলির বুকে ।
 কৃষক গাহিত হাল বাহিতে নানান ছন্দেতে গান,
 মাটির মানুষে মাটির সুরেতে মোহিত করিত প্রাণ ।
 ঘিরিয়া বসিত বুড়ী ঠাকুমারে খোকাখুকী মিলি,
 আহার নিদ্রা তুচ্ছ হত তাদের গুনিতে ঐ ছড়াগুলি ।
 ডুবিয়া যেতেছে লোকসাহিত্য সূর্য পটের মত,
 মাটির সংগে মাটির সুরগুলি সকল হতেছে গত ।
 আজীবন যার লোকসাহিত্যে অতিশয় দরদ ছিল,
 আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ পরলোকে চলে গেল ।
 ছিলাম যার বলে বলি সেই গেল চলি আমারও ঘাটে তরী,
 অমূল্য সম্পদ লোকসাহিত্য কেমনে উদ্ধার করি ।
 শহর সংস্কৃতির কদর বেড়েছে গ্রাম্য সংস্কৃতি নাই,
 কিন্তু সংস্কৃতির উৎস গ্রাম্যসংস্কৃতি কেহ না ফিরিয়ে চাই ।
 মহররমের চাঁদ উঠিত যখন জারি গানের ধূয়া গুনি,
 কারবালার কাহিনী শ্রবণ করে চোখে আগিত পানি ।
 বসন্ত উৎসবে ছলি গান চলিত প্রশ্ন-উত্তর হত বেশ,
 সারা রাত্র লোক বসিয়া গুনিত রাত্র ভোর হলে শেষ ।
 গাজী গায়করা গিয়া পাড়াপাড়া পালা গান করিত জানি,
 গাজী কালুর ফকির সাধনা অদ্ভুত কাহিনী গুনি ।
 মালকা বানুর গান রেকর্ডে বাজে গুনিতে পাই আজি,
 আরও দেবল্যা বানালি মোরে সম্পানের মাঝি ।
 দুই শত বৎসরের এই সকল সুর লোকের মুখে মুখে চলে,
 চট্টগ্রামের নিজস্ব সুর এইসব জানে কি কোন কালে ।
 প্রতিভাবান বহু শিল্পী চাঁটগায় ছড়ায়ে আছে,
 সহানুভূতি হীন অপাংক্ত্যেয় হয়ে দিন কাটিতেছে ।
 আধুনিক শিল্পীরা তাদের সংগে হাত মিলাবে আজি,
 গীমাস্ত চটল লোক সংস্কৃতির উঠবে ঢংকা বাজি ।

[৪২ গান]

বুড়িরে কেহ না পারে বুঝ দিত ।
 কান্দি কান্দি খুন হর বুড়ি হিন্দুস্তান যাইত ।
 বুইগার আশা একলা যাইব বুড়িরে হংগে ন নিত ॥
 বুড়ির মনর ভিতর খোঁজ,
 দুঃখে কষ্টে পার হৈ গেলে কনে ধরের দোষ,
 বেহান বিকাল করে আপসোশ আটার রুটি ডাইল খায় ।
 যারা হিন্দুস্তান যাইব, দণ্ডকারণ্য রাম বনবাস হেই জাগাত নিব,
 যম দুয়ারত হাজির হৈইব, বাঘ ভাল্লুকে ভিল্কাই ।
 হেডের খবর জাননি, বার জঙ্গল আবাদ করের রিপুজি আনি ।
 বুজ্যা বুড়ির বল আছে নি গাছর ঝুঁয়া উলডাইত ।
 বহুত হিন্দুস্তানত যাই, ধাই চলি আইল পাকিস্তানত ভাত পানি ন পাই ॥
 বুজ্যা বুড়ি দোনজন যাই হিতারে জিজ্ঞালে গৈ বুঝ পাইত ।
 মামা ভাইগা ঝি, জামাই ছকুলুন রইল । [অসমাপ্ত]

[৪৩ ধর্মের শোষণ]

সমাজের পুরোহিতগণ, বৈদিকের পূজা পার্বণ,
 সম্পাদনে ব্যস্ত সর্বদাই।
 একটুখানি দিষ্টি দিলে, ওসব কাজে শোষণ চলে,
 স্বার্থ সিদ্ধি উদ্দেশ্য সদাই।
 পূজা পার্বণ দেবার্চন, অথবা শ্রাদ্ধ তর্পণ,
 হিন্দু ঘরে বার মাস চলে।
 প্রত্যেক পুরোহিত দলে, কাজ চালায় এই কৌশলে,
 দোয়া ফাতেরা শ্রাদ্ধ বলে।
 চাউল আর তরকারী, উৎসর্গ হয় হিন্দু বাড়ী,
 মুসলিম বাড়ী সিদ্ধ সমুদয়।
 তাত তরকারি পাক করে, বাড়ী নিবে কেমন করে,
 এ রহস্য বুঝা কঠিন নয়।
 বাড়ী বাড়ী শ্রাদ্ধ করায়, ভোজে খেশারি পায়,
 বাড়ী নিয়া রাখে ভাণ্ড ভরি।
 তিন-চার সের জমা হয়, তিনির বাবার শ্রাদ্ধ সময়,
 নিমন্ত্রণ করতে যায় জজমান বাড়ী।
 অনেকদিনের ডাইলগুলি, ঠিক যেন লোহার গুলি,
 চুলার উপর দিয়াছে চড়াই।
 সাঝাদিনেও হয় না সিদ্ধ, সিদ্ধ করে কার বাবার সাধ্য,
 স্বয়ং অনুপূর্ণা এলেও সাধ্য নাই।
 পাঁচ রকম তরকারী, ঘন্ট একখানা পাক করি,
 বলে জজমান প্রসাদ নিয়া যান।
 খানা এই হল খাওয়া, তারপর দাক্ষিণ্য দেওয়া,
 বিচার করুন এটা কোন বিধান।
 জজমান বাড়ী ব্রাহ্মণ ভোজন, শেষ হয়ে যাবে যখন,
 তারপর দাক্ষিণ্য পায় দেখি।
 ব্রাহ্মণ বাড়ী জজমান যায়, দাক্ষিণ্য লয় কোন কথায়,
 পুরোহিত ঠাকুর হোটেল দিয়াছে নাকি।
 মুসলিমের সবেবরাতে, গোসত-রুটি ফাতেরাতে,
 মোল্লাসাহেব বাড়ী নিয়া যায়।
 মেয়ে মানুষ ঘরে গেলে, চল্লিশায় অলংকার দিলে,
 সেই অলংকার মোল্লা সাহেব পায়।
 বৌদ্ধ ভিক্ষু যারা, নাই তাদের পুত্র দারা,
 বিহারে জীবন কাটায় জানি।
 দিলে ভোজন দাক্ষিণ্য, তখন তারা হাতে ছোয়না,
 গামছা বেঁকে মাজায় দিতে গুজি ॥

১৯৮৮৫৩, গোমদণ্ডী।

[৪৪ ধর্ম নামে স্বার্থ]

ধর্ম ধর্ম বলে লোকে, ধর্ম কি চোখে দেখে,
 প্রকারান্তরে শোষণ করা যন্ত্র।

এখন উপবাসে রবে, পরকালে স্বর্গে যাবে,
 কানে কানে দিয়া এই মন্ত্র ।
 অর্থ অনর্থ সার, আগে করেছে প্রচার,
 ভাগ্যবিধাতা একজন আছে ।
 তার সঙ্গে নাই মারামারি, আমারে কাঙাল করি,
 কেনইবা এই দুঃখ দিতেছে ।
 দয়াতে ধর্ম স্থাপন, শাস্ত্র সুসিদ্ধ বচন,
 কারও দুঃখ দেখে দয়া হলে ।
 কানাকড়ি নাই হাতে, দুঃখীর দুঃখ মুছিতে,
 অভাবে পারি কি কোন কালে ।
 রাজা ধনী জমিদারে, ব্রাহ্মণ সাধু সওদাগরে,
 সেজেছে ধর্মের অগ্রদূত ।
 নির্যাতন নিপীড়ণ, প্রাণান্ত কর গোষণ,
 ধর্মের কর্ম দেখতে কি অসুদ ।
 শিক্ষার উন্নত স্তরে, মানুষ আরোহণ করে,
 বীরে বীরে আঁধার যাবে কাটি ।
 শীতলা আর সত্য পীর, মনসা মঙ্গলচণ্ডীর,
 ক্রমে ক্রমে পূজা যাবে উঠি ।
 কলেরা হাম বসন্ত, লোকের করে প্রাণান্ত,
 হিন্দুভাইগণ জালাকুমারি পূজে,
 মুসলিমে পাড়া বন্, কলেরা বন্ধ কারণ,
 ধর্মভীরু কি জানি কি বুঝে ।
 প্রতিকাজে পুরোহিতে, সূচতুর ইফ্রন যোগাতে,
 দান কর দুর্গতি যাবে খণ্ডি ।
 শিগ্গি করে কিওন খায়, কলেরা আশ্রয় যায়,
 ধর্মের কি দুর্ভেদ্য গণ্ডী ।
 ভ্যাকসিন কি টিকা নিতে, রাজী নাই কোনমতে,
 এইত ধর্মের বেডাজাল ।
 তারপর আনে পরলোক, সরল মনে বাড়ায় ঝোক,
 কে জানে আর যাবে কতকাল ।
 ফুটেছে জ্ঞান চক্ষু, কেথায় যাবে বৌদ্ধ ভিক্ষু,
 কোথায় যাবে পাদ্রী ব্রাহ্মণ ।
 বাজিবে বাস্তবের ঢংকা, অবাস্তবের আশংকা,
 চলে কেবল দেবতালয় শোষণ ।
 কালী দুর্গা কি কর গাই, মানত করে বেঁচে যায়,
 পাঁঠা মহিষ গরু বলি দিত ।
 বড়লোক কি রাজার ছেলে, মানুষ দুইটা বলি দিলে,
 বোধ করি অমর হয়ে যেত ।
 জীবের বদল জীব দিবে, তখন রোগী বেঁচে যাবে,
 এই ধারনায় আছে সর্বদাই ।
 ক্রমে সব হবে শেষ, জাগিবে সকল দেশ,
 লোকের চোখে ধূলা দেওয়া দায় ।
 বড়দোয়া কি দিলে শাপ, গোপ্তা শুদ্ধ হবে ছাপ,
 বংশে বাস্তি জলবেনা কখন ।

বৃটিশ দুইশত বৎসর ধরে, হিন্দু মুসলিম শোষণ করে,
 বড়দোয়া দিল না কি কারণ।
 শিক্ষাতে দিয়া মন, করান সবে প্রাণপণ,
 সমাজ উন্নতির দিকে যাবে।
 নানারকম গোজামিলে, দেশ যায় রসাতলে,
 হঠকারিতা বন্ধ করতে হবে ॥

৫। ১২। ৫৪, ঢাকা জেল।

[৪৫]

ভাইসব সবুর করুন সকলে,
 চীন সরকার পাঠাইব খানা আর কয়দিন গেলে।
 মোনায়েম খাঁ জোর গলাতে, প্রচার করে ঢাকে ঢোলে,
 এই সব ভানুমতীর খেলে ॥
 আমার বাড়ী পাকছে কাঁঠাল, ঠোঁটে লাগাও তেল,
 দুইমাস পর পাইব খানা, বর্গার ভাই বাঁচিলে।
 ভাই বিপদ অভিশয়, দুই নৌকাতে পা রেখেছে কি জানি কি হয়,
 'শাম' রাখিনা সমাজ রাখি, কী ঘটে যায় শেষ কালে ॥
 দশ লক্ষ টন চাউল আসিবে, দুই লক্ষ টন গম,
 আসে না আসে পরের কথা প্রচারে বিষম।
 কাজের বেলা নাইত বেশকম, পেট ভরেনি শুনালে।
 শুন যত দেশের ভাই,
 নিজে হুশিয়ারে চল কান্দিলে লাভ নাই।
 যদি স্বায়ত্তশাসন পাই সর্বদুঃখ যাবে চলে ॥

১৬। ১১। ৬৬।

[৪৬ অনাস্থায় ধর্ম ছড়া]

সত্য ত্রেতা দ্বাপর হতে ধর্মটি প্রবল,
 ধর্ম কর্ম করে লোকে সাধিতে মঙ্গল।
 শাক্ত সৌর গাণপত্য শিব বিষ্ণু পঞ্চ,
 ইহকালে ধর্ম কর্মে স্বর্গে সুখে বঞ্চে।
 আধুনিক সমাজে দেখি ধর্মের প্রাবল্য,
 ধর্মকর্ম করে লোকে লভিতে কৈবল্য।
 শীতলা মনসা চণ্ডী শিব দুর্গা রাম,
 সূর্য গণেশ শনিগ্রহ কিবা রাধা শ্যাম।
 মুসলিম বন্ধুরা ডাকে এক পরোয়ার,
 দ্বিতীয় মোহাম্মদ নবী প্রেরিত খোদার।
 পীর পয়গম্বর কত মানে একমনে,
 হজ নমাজ কলমা রোজা মুক্তি সন্ধানে।
 হিন্দু ভাইগণ কি শুনে করে গরাগরি,
 গয়া কাশি শ্রীবন্দাবন কত ঘুরাঘুরি।
 বৌদ্ধ ভিক্ষু দারা ত্যাগি কর্মযোগে মন,
 অষ্টশীল নির্বাণ আশে করিছে পালন।

প্রহ্লাদে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল,
হস্তিপদ তলে পরে কভু না মারিল।
গলায় বাঁধিয়া শিলা ডুবাইল জলে,
শুধু পাইল রক্ষা পরে তপ্ত তৈলে।
ইব্রাহিম খলিলে যবে ঢালিল আগুনে,
আগুনে ফুলের বাগান ঈমানের গুণে।
গনতুল্যে গুলে দিল আনাল হক ফুকারে,
জকরিয়া পয়গম্বরে করাত দিয়া চিরে।
বুদ্ধকে করিতে ভয় দেবদত্ত চায়,
অটল অচল তিনি ছিলেন সর্বদায়।

[৪৭ বিধাতার বিগদ]

জন্ম মৃত্যু বিবাহ, বিধির ইচ্ছায় নির্বাছ,
সকল শাস্ত্র বলে শুনতে পাই।
কলিকালের দেখে গতি, বোকা বনেছে প্রজাপতি,
দোয়াত কলস ফেলেছে হারাই।
দেখা যায় পৃথিবীময়, মানবজাতি জন্ম লয়,
লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলেছে।
দিনের পর দিন খাদ্য সংকট, হয়ে উঠেছে প্রকট,
হৃষ্টিকর্তা ফাঁপরে পরেছে।
বিষ্ণু বলে ব্রহ্মা ভাই, এখন করি কি উপায়,
চাউলত আর দিতে নাহি পারি।
গম বজরা দিলাম যত, চলে যায় নস্যের মত,
এই সংকট কেমন করে সারি।
ব্রহ্মা বলে যুক্তি আছে, যেটা মরে যেটা বাঁচে,
চল দ্বরা যমের কাছে যায়।
তুমি আমি যম মিলে, বুদ্ধি করে দাড়ায়ে,
মাথা তুলে কারও সাধ্য নাই।
ব্রহ্মা বিষ্ণু তাড়াতাড়ি, চলে গেল যমের বাড়ি,
বলে তোমার প্রমোদন এসেছে।
তুমি একবার জোর করে, আধপেটা ব্যবস্থা করে,
দিয়া চাও কি মরে কি বাঁচে।
শুনে তখন যমে কয়, পেট ভরান আমার কাজ নয়,
রিষিক দাতা বিষ্ণুতো রয়েছে।
যমদূত ঘুরায়ে চায়, বাহুতে আর শক্তি নাই,
দেশে যখন দুর্ভিক্ষ এসেছে।
উঠল মহা হাহাকার, সংখ্যা বাড়ি অনিবার,
যমকে বলে জোরে কাজ চালাও।
যত পার তত মার, শীঘ্র দেশ খালাস কর,
চেষ্টা করে মোদের প্রাণ বাঁচাও।
শুনিয়া বিধাতার কথা, যম করে হেট মাথা,
ধংসলীলা আর কত পারি।

কমায়ে দাও উৎপাদন, তবে বাঁচিবে জীবন,
 শীঘ্র শীঘ্র বার্থ-কণ্টোল করি।
 তখন বিষ্ণু উঠি বলে, কাজ হবে কৌশলে,
 অনুপূর্ণা স্মরণ কর এবে।
 বিপদ দেখিবে গতিক, জলে আর রবেনা ঠিক,
 অনুপূর্ণা সব ঠিক করে দেবে ॥

টীকা ও উৎস-নির্দেশ

- ১ Hai, Muhammad Abdul. 'Folk Song and Folk Literature., "Traditional Culture in East Pakistan" (Edited by : Shahidullah, Muhammad & Hai, Muhammad Abdul.). University of Dhaka, Bangladesh. December, 1963. pp-20
- ২ স্বকুমার সেন। "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"। মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, ভারত। ১ম সংস্করণ : ১৯৪০। পৃ. ১০৫২
- ৩ এই দম্পতির আরও তিনজন কন্যা সন্তান ছিল।
- ৪ অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তীকে লেখা কবিরালের ব্যক্তিগত পত্র।
 ড. পুলক চন্দ। "গণকবিরাল রমেশ শীল ও তাঁর গান"। কথাশিল্প, কলকাতা, ভারত। বৈশাখ ১৩৮৫। পৃ. ৭৮
- ৫ পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৮
- ৬ ড. পূর্ণেন্দু দস্তিদার। "কবিরাল রমেশ শীল"। লালন পাবলিশার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ। আগষ্ট ১৯৬৩। পৃ. ৪
- ৭ মধ্যযুগের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত চট্টগ্রামের মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বার্মা চাকুরী ও ব্যবসা করে জীবন নির্বাহ করত। এ বিষয়ে একটি লোকছড়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহুল প্রচলিত ;

‘ইকিনি বাছার গুণগুণি ঠেং
 কে-নে বাছা রেঙ্গুন গেল’...

[এতটুকুন ছেলে, ছোট ছোট পা,
 কি করে ছেলে রেঙ্গুন গেল’...]

- ৮ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা', 'আমার বাংলা'।
 নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ভারত।
- ৯ "কবিরাল রমেশ শীল"। পৃ. ৬
- ১০ অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তীকে লেখা কবিরালের ব্যক্তিগত পত্র।
 ড. "গণকবিরাল রমেশ শীল ও তাঁর গান"। পৃ. ৮০
- ১১ ড. "গণকবিরাল রমেশ শীল ও তাঁর গান"। পৃ. পঁচিশ
- ১২ এ বিষয়ে তাঁর রচনায় পাওয়া যায়,
 ... 'শুন আর এক বিবরণ,
 জলে মন উঠিলে মনেতে,
 হাজী নস্র মালুম ছিল মাদারবাড়ীতে

কি কব তার গুণের কথা
যথা তথা আছয়ে প্রকাশ, ...

ড. “কবিরায় রমেশ শীল”। পৃ. ৬

- ১৩ মাইজভাণ্ডারে পীরের প্রতিষ্ঠা বঙ্গে লৌকিক পীরবাদের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ভিনু পথগামী সূফী মতবাদ হতে এ সকল লৌকিক পীরবাদের সূচনা। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ সকলেই মাইজভাণ্ডারের শিষ্য হতে পারে।
- ১৪ ড. রমেশ শীল। ‘নিবেদন’, ‘আশেকমালা’। পুলিনবিহারী শীল, গোমদগুী, চট্টগ্রাম। ৪র্থ সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৭৯। পৃ. ক
- ১৫ কারও কারও মতে রমেশ শীলের মাইজভাণ্ডার ওরশে যাওয়ার একটি উদ্দেশ্য ছিল ঔষধ বিক্রী। প্রসঙ্গতঃ রমেশ শীল নিজে কবিরাজী মতে রোগের চিকিৎসা করতেন। তাঁর প্রতিটি পুস্তকের তৃতীয় প্রচ্ছদে ‘ফকিরি প্রদত্ত দুইটি রোগের ঔষধ’ (বাতের ও যৌন রোগের)-এর বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হত।
- ১৬ রমেশ শীলের একটি বক্তৃতার অংশ।
ড. “গণকবিরায় রমেশ শীল ও তাঁর গান”। পৃ. চব্বিশ
- ১৭ পূর্ণেন্দু দস্তিদারের মতে হেদায়েত ইসলাম ও ফণি বড়ুয়া এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন। [ড. “কবিরায় রমেশ শীল”। পৃ. ২২] হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে ‘রমেশ উদ্বোধন-কবি-সংঘ’-এর কমিটি ছিল নিম্নরূপ ;
সভাপতি : রমেশ শীল। সহ-সভাপতি : হেদায়েত ইসলাম খাঁ।
সম্পাদক : ধীরেন্দ্রলাল সেন। কোষাধ্যক্ষ : নগেন্দ্রচন্দ্র দে। সদস্য : ফণীন্দ্রলাল বড়ুয়া, রাইগোপাল দাস, মণীন্দ্র দাস, গোবিন্দচন্দ্র দে, বরদাচরণ দে, তারাচরণ দাস ও সারদাচরণ বড়ুয়া।
[ড. “গণকবিরায় রমেশ শীল ও তাঁর গান”। পৃ. বত্রিশ]
- ১৮ IPTA (ভারতীয় গণনাট্য সংঘ) গঠন এ সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ ফল।
- ১৯ ড. “গণকবিরায় রমেশ শীল ও তাঁর গান”। পৃ. চুয়াট্টা
- ২০ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীতে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, গোপাল হালদার প্রমুখ।
- ২১ ড. “People’s War.” Calcutta, India. April 1, 1945 Issue.
সেদিনের গানের বিষয় ছিল “কৃষক ও মজুরদার”।
- ২২ “কবিরায় রমেশ শীল”। পৃ. ৪৪
- ২৩ সম্মেলনের অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে ছিল স্নকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা ; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যপাল অমৃতপদ ভট্টের ভাষণ।
- ২৪ এই সময়ে রমেশ শীল শেখ গোমানির সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় সাহপ্ৰ-দায়িক সম্প্রীতির জন্য গান করেন। আবার পার্ক সার্কাস এলাকায় ‘যুদ্ধ ও শান্তি’ শীর্ষক কবিগানে অংশ নেন।
- ২৫ এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, মূলকরাজ আনন্দ, কৃষ্ণ চন্দ্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নরহরি কবিরাজ, তিমির বরণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, মনোজ বসু, রমেশ চন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, নরেন

দেব, হীরেন মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, পঙ্কজ মল্লিক, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সন্তোষ সেনগুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

- ২৬ জেলে তার সহবন্দীরা যে খাতা উপহার দেন তার মধ্যে মোস্তফা সারওয়ার, সত্যেন সেন, গাজীউল হক, সন্তোষ গুপ্ত ও চুনী চক্রবর্তীর কবিতা এবং আবদুস সামাদ আজাদ, আবদুস সাত্তার, আমির-উল-ইসলাম প্রমুখের শ্রদ্ধাঞ্জলি রয়েছে।
- ২৭ দ্র. পত্র No. 1004-Edn. Dated Dacca, 5-2-1959. Memo No. 711/35 Education Department, Govenment of East Pakistan. OM-1S-57
- ২৮ দ্র. পত্র No. 203-Edn. Dated Dacca, 20-4-1962. Memo No. 4311/45 Education Department, Government of East Pakistan. OM-61S/57
- ২৯ চট্টগ্রাম শহরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও গোমদণ্ডীর পার্শ্ববর্তী কধুরখীল গ্রামে জসীম-উদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সূফিয়া কামাল প্রমুখের সঙ্গে রমেশ শীল রবীন্দ্র-শতবাষিকী উৎসবে যোগ দেন।
- ৩০ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওস্তাদ আয়েত আলী খান।
- ৩১ অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের হস্তলিখিত এই মানপত্রটি বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।
- ৩২ দ্র. বা/এং পত্র নং : ১৭৩/২। তারিখ ৬-১-১৯৬২
- ৩৩ রমেশ শীল সম্বর্ধনা সংসদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সাইফুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, ওহীদুল আলম, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, মুহম্মদ ইউনুস, মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী, মোহাম্মদ খালেদ প্রমুখ। সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল ফজল। অন্যান্যের মধ্যে এ সভায় কবি জসীমউদ্দীন ও মাহমুদ নূরুল হুদা আলোচনায় অংশ নেন।
- ৩৪ দ্র. “স্মারক”। রমেশ শীল সম্বর্ধনা সংসদ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। এপ্রিল ১৯৬৪। পৃ. ৯
- ৩৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ৯-১-৬৪ তারিখে এক পত্রে কবিরায় এ সব কথা লিখেন।
- ৩৬ তাঁর এ বিষয়ক একটি পত্রের প্রতিলিপি বর্তমানে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর সাংবাদিক অরুণ দাশের নিকট সংরক্ষিত আছে।
- ৩৭ দ্র. নূরুল ইছলাম চৌধুরী। “অপরাজেয় লোক-কবি করিম বখশ”। বুক সেন্টার, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ১৯৬৫। পৃ. ১০
- ৩৮ দ্র. পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯
- ৩৯ পূর্ণেন্দু দস্তিদার (সম্পাদিত)। “লোকগীতি”। রমেশ শীল সম্বর্ধনা সংসদ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। এপ্রিল ১৯৬৪।
- ৪০ পুলক চন্দ (ভূমিকা ও সংকলন)। “গণকবিরায় রমেশ শীল ও তাঁর গান”।
- ৪১ দ্র. পূর্বোক্ত। পৃ. ৮০
- ৪২ দ্র. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত)। “পাণ্ডুলিপি”, নবম খণ্ড। বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ১৩৮৮।